অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। কিন্তু তফসীরবিদরা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। উদাহরণত মসনদে-আবদুর রাজ্জাকে হযরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত আছে ঃ

কোন এক জিহাদে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম এক জায়গায় অবস্থানরত ছিলেন। বিস্তৃত ময়দানের বিভিন্ন অংশে সাহাবীরা বিশ্রাম নিতে লাগলেন। এদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি গাছের ডালে তরবারি ঝুলিয়ে তার নিচে শুয়ে পড়লেন। শত্রুদের মধ্য থেকে জনৈক বেদুঈন সুযোগ বুঝে তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে প্রথমেই তরবারিটি হাত কর ফেলল। অতঃপর তাঁর দিকে তরবারি উঁচিয়ে বলল ঃ এখন আমার কবল থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে?

রসূলুল্লাহ্ (সা) চকিতে উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা। আগন্তুক আবার তার বাক্য পুনরাবৃত্তি করল। তিনিও নিশ্চিন্তে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা। কয়েকবার এরূপ বাক্য বিনিময় হওয়ার পর অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে আগন্তুক তরবারি কোষবদ্ধ করতে বাধ্য হল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের ডেকে ঘটনা শোনালেন। আগন্তুক বেদুঈন তখনও তাঁর পাশেই উপবিষ্ট ছিল। তিনি তাকে কিছুই বললেন না। —-(ইবনে-কাসীর)

কোন কোন সাহাবী থেকে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, ইহুদী কা'ব ইবনে আশরাফ একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বগৃহে দাওয়াত করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রসূলকে যথাসময় এ সংবাদ দিয়ে শত্রুর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন।---(ইবনে -কাসীর)

হযরত মুজাহিদ, ইকরিমা প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার এক মোকদ্দমার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা) বনী-নুযায়রের ইহুদীদের বস্তিতে যান। তারা তাঁকে একটি প্রাচীরের নীচে বসতে দিয়ে কথাবার্তায় ব্যাপৃত রাখে। অপর দিকে আমর ইবনে জাহ্শ নামক এক দুরাত্মাকে নিয়োগ করা হয় প্রাচীরের পেছন দিক থেকে উপরে উঠে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড তাঁর উপর গড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরকে তাদের সংকল্পের কথা জানিয়ে দেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে প্রস্থান করেন।--- (ইবনে-কাসীর)

এসব ঘটনায় কোন বৈপরীত্য নেই---সবগুলোই আলোচ্য আয়াতের সাক্ষী হতে পারে। আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের অদৃশ্য হিফাযতের কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ

اِتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ এতে প্রথমত বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নিয়ামত লাভ করা একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বৈশিষ্ট্য নয়, বরং সাহায্য ও অদৃশ্য হিফাযতের আসল কারণ হচ্ছে তাকওয়া তথা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা। যে কোন জাতি অথবা ব্যক্তি যে কোন সময় যে কোন স্থানে এ দু'টি গুণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তারই এভাবে হিফাযত ও সংরক্ষণ করা হবে। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন ঃ

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
اُتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی -

"বদরের পরিবেশ সৃষ্টি কর। ফেরেশতারা এখনও তোমার সাহায্যার্থে আসমান থেকে কাতারে কাতারে অবতরণ করতে পারেন।"

আলোচ্য বাক্যটিকে পূর্ববর্তী আয়াত সমষ্টির সাথেও সংযুক্ত করা যায়, যাতে চরম শত্রুদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সুবিচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, এহেন ঘোর শত্রুদের সাথে সদ্ব্যবহার ও উদারতার শিক্ষা বাহ্যত একটি রাজনৈতিক ভ্রান্তি এবং শত্রুদের দুঃসাহসী করে তোলার নামান্তর। তাই এ বাক্যে মুসলমানদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা যদি আল্লাহ্-ভীরু ও আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী হও তবে এ উদারতা ও সদ্ব্যবহার তোমাদের জন্য মোটেই ক্ষতিকর হবে না, বরং তা শত্রুদের বিরুদ্ধাচরণে দুঃসাহসী করার পরিবর্তে তোমাদের প্রভাবাধীন ও ইসলামের নিকটবর্তী করার কারণ হবে। এ ছাড়া আল্লাহ্-ভীতিই মানুষকে অঙ্গীকার মেনে চলতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক থেকে বাধ্য করতে পারে। যেখানে আল্লাহ্-ভীতি নেই, সেখানে অঙ্গীকারের দশা তা-ই হয়, যা আজকাল সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এ কারণে পূর্ববর্তী যে আয়াতে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছিল, সেখানে আয়াতের শেষাংশে وَاتَّقُوا اللَّهَ (আল্লাহ্কে ভয় কর) বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এ বাক্যটি আবার উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া সম্পূর্ণ আয়াতে এদিকেও ইশারা করা হয়েছে যে, মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য শুধু বাহ্যিক সমরোপকরণের উপর মোটেও নির্ভরশীল নয়, বরং তাদের আসল শক্তি তাক্ওয়া ও আল্লাহ্র উপর ভরসা করার মধ্যেই নিহিত।

আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার এবং তাদের তা পালন করার কারণে ইহকাল ও পরকালে বিরাট সাফল্য দানের কথা উল্লেখ করার পর এর বিপরীত দিকটি ফুটিয়ে তোলার জন্য দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইতিপূর্বে অন্যান্য উম্মতের কাছ থেকেও এ ধরনের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ফলে তারা বিভিন্ন রকমের আযাবে পতিত হয়। বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাইলের কাছ থেকেও একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। সে অঙ্গীকার নেওয়ার প্রকৃতি ছিল এরূপঃ বনী ইসরাইলের সর্বমোট বারটি পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন করে সর্দার নির্বাচন করা হয়। প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক সর্দার এ দায়িত্ব গ্রহণ করে যে, আমি এবং আমার গোটা পরিবার এ অঙ্গীকার মেনে চলব। এভাবে বার জন সর্দার সমগ্র বনী ইসরাইলের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাদের দায়িত্ব ছিল এই যে, তারা নিজেরাও অঙ্গীকার মেনে চলবে এবং নিজ নিজ পরিবারকে মেনে চলতে বাধ্য করবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে ইসলামের আসল মূলনীতি হচ্ছে এইঃ

بندۂ عشق شدی ترک نسب کن جامی
کہ دریں راہ فلاں بن فلاں چیزے نیست

হে জামী ! প্রেমের পথের অনুসারী হও এবং বংশ-পরিচয় ভুলে যাও। এ পথে 'অমুকের পুত্র অমুক' এ পরিচয়ের কোনই মূল্য নেই ।।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে সুস্পষ্টভাবে একথা ঘোষণা করেন যে, ইসলামে আরব-অনারব, কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ এবং উচ্চ-নীচ জাতের কোন মূল্য নেই। যে-ই ইসলামে প্রবেশ করে, সে-ই মুসলমানদের ভাই হয়ে যায়। বংশ, বর্ণ, দেশ, ভাষা ইত্যাদি জাহিলিয়াত যুগের স্বাতন্ত্র্যের মূর্তিকে ইসলাম ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রশাসনিক ব্যাপারাদিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেও পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করা হবে না ।

এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, এক পরিবারের সদস্যবর্গ স্বীয় পরিবারের জানাশুনা ব্যক্তির উপর অন্যের তুলনায় অধিক ভরসা করতে পারে। এ ব্যক্তিও তাদের পূর্ণ মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়ার কারণে তাদের মনোভাব ও ভাবাবেগের প্রতি অধিক লক্ষ্য দিতে পারে। এ রহস্যের উপর ভিত্তি করেই বনী ইসরাইলের বারটি পরিবারের কাছ থেকে যখন অঙ্গীকার নেওয়া হয়, তখন প্রত্যেক পরিবারের একেকজনকে দায়িত্বশীল সাব্যস্ত করা হয়েছিল ।

এই প্রশাসনিক উপযোগিতা ও পূর্ণ প্রশান্তির প্রতি তখনও লক্ষ্য রাখা হয়েছিল যখন বনী ইসরাইল পানির অভাবে দারুণ দুর্বিপাকে পড়েছিল। তখন মূসা (আ)-র দোয়া ও আল্লাহর নির্দেশে একটি পাথরের গায়ে লাঠি দ্বারা আঘাত করলে আল্লাহ্ তা'আলা পাথর থেকে বার পরিবারের জন্য পৃথক পৃথক বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত করে দেন ।

সূরা আ'রাফে এ বিরাট অনুগ্রহের বিষয়টি এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا —আমি তাদের বারটি পরিবারকে বার দলে বিভক্ত করে দিয়েছি এবং فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا —অতঃপর পাথর থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে গেল (প্রত্যেক পরিবারের জন্য পৃথক পৃথক)। বলতে কি, বার সংখ্যাটিই অভিনব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন মদীনার কিছুসংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে মক্কায় সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তিনি বয়াতের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তখন সে অঙ্গীকারেও মদীনার বার জন সর্দার দায়িত্ব গ্রহণ করে বয়াত করেছিলেন। তাদের মধ্যে তিনজন ছিলেন আউস গোত্রের এবং নয়জন খাযরাজ গোত্রের।---(ইবনে-কাসীর)

বোখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে সামুরার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মানুষের কাজকর্ম ও আইন-শৃঙ্খলা ততক্ষণই ঠিকমত চলবে, যতক্ষণ বার জন খলীফা তাদেরকে নেতৃত্ব দেবেন। ইবনে-কাসীর এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন ঃ এই হাদীসের কোন শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, এই বারজন খলীফা একের পর এক অব্যাহত গতিতে আগমন করবেন। বরং তাঁদের মধ্যে ব্যবধানও হতে পারে। সেমতে চারজন খলীফা হযরত আবূবকর সিদ্দীক, ওমর ফারূক, ওসমান গনী ও আলী মুর্তাযা রাযিআল্লাহু আনহুম একের পর এক আগমন করেন। অতঃপর মাঝখানে কয়েক বছর ব্যবধানের পর আবার হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযকে সর্বসম্মতিক্রমে পঞ্চম যথার্থ খলীফা গণ্য করা হয়।

মোট কথা, বনী ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বার পরিবারের বার জন সর্দারকে দায়িত্বশীল করে বললেন ঃ إِنِّي مَعَكُمْ আমি তোমাদের সাথে আছি। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা অঙ্গীকার মেনে চল এবং অপরকেও মেনে চলতে বাধ্য করার সংকল্প গ্রহণ কর, তবে আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে। এরপর আলোচ্য আয়াতে অঙ্গীকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দফা, বনী ইসরাইলের অঙ্গীকার ভঙ্গকরণ এবং তাদের উপর আযাব নেমে আসার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

অঙ্গীকারের দফা উল্লেখ করার আগে إِنِّي مَعَكُمْ বলে দু'টি বিষয় বলে দেওয়া হয়েছে। এক. যদি তোমরা অঙ্গীকারে অটল থাক, তবে আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে এবং তোমরা প্রতিপদে তা প্রত্যক্ষ করবে। দুই. আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা সর্বত্র তোমাদের সাথে আছেন এবং অঙ্গীকারের দেখাশোনা করছেন। তোমাদের কোন ইচ্ছা, চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্ম তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি তোমাদের নির্জনতার রহস্যও জানেন এবং শোনেন। তিনি তোমাদের মনের নিয়ত ও ইচ্ছা সম্পর্কেও জ্ঞাত রয়েছেন। অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে তোমরা তাঁর কবল থেকে কিছুতেই বাঁচতে পারবে না। এরপর অঙ্গীকারের দফাসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামায কায়েম করা ও পরে যাকাত দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, নামায ও যাকাত ইসলামের পূর্বে হযরত মূসা (আ)-র সম্প্রদায়ের উপরও ফরয ছিল। কোরআনের অন্যান্য ইঙ্গিত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে এবং প্রত্যেক শরীয়তে সর্বদাই এগুলো ফরয ছিল। অঙ্গীকারের তৃতীয় দফা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সব পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং পথ প্রদর্শনেরই কাজে তাঁদের সাহায্য-সহায়তা করা।

বনী ইসরাইলের মধ্যে অনেক রসূল আগমন করেছিলেন। এ কারণে বিশেষ-ভাবে এ বিষয়ের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। ঈমান সম্পর্কিত বিষয়াদির স্থান মর্যাদার দিক দিয়ে নামাযও যাকাতের অগ্রে, কিন্তু কার্যত যা করণীয় ছিল, তাকেই অঙ্গীকারের

আগে রাখা হয়েছে। রসূল তো পরেই আসবেন, তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও সাহায্য করাও পরেই হবে। এ কারণে এগুলোকে পেছনে রাখা হয়েছে।

অঙ্গীকারের চতুর্থ দফা হচ্ছে এই ঃ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌কে ঋণদান কর---উত্তম ঋণ। উত্তম ঋণের অর্থ ঐ ঋণ, যা আন্তরিকতা সহকারে দান করা হয় যাতে কোন জাগতিক স্বার্থ জড়িত না থাকে এবং আল্লাহ্‌র পথে প্রিয়বস্তু দান করা। অকেজো ও বেকার বস্তু দান না করাও উত্তম ঋণের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করাকে ঋণদান শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, ঋণকে আইনত, সাধারণের প্রথাগত এবং চরিত্রগত দিক দিয়ে অবশ্য পরিশোধযোগ্য মনে করা হয়। এমনিভাবে এরূপ বিশ্বাস সহকারে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে হবে যে, এর প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া যাবে।

স্বতন্ত্রভাবে ফরয যাকাত উল্লেখ করার পর এখানে উত্তম ঋণ উল্লেখ করাতে বোঝা যায় যে, উত্তম ঋণ বলে অন্যান্য সদকা-খয়রাতকে বোঝানো হয়েছে। এতে আরও বোঝা যায় যে, শুধু যাকাত প্রদান করেই মুসলমান আর্থিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায় না। যাকাত ছাড়াও কিছু আর্থিক দায়িত্ব বহন করা তার উপর জরুরী। কোথাও মসজিদ না থাকলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা এবং সরকার ধর্মীয় শিক্ষার ব্যয় বহন না করলে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা মুসলমানদের কর্তব্য। পার্থক্য এতটুকু যে, যাকাত ফরযে আইন আর এগুলো হল ফরযে-কেফায়া।

ফরযে-কেফায়ার অর্থ এই যে, সমাজের কিছু লোক অথবা কোন দল এসব প্রয়োজন মিটিয়ে দিলে অন্য সব মুসলমান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করে। আর যদি কেউ এসব প্রয়োজন না মিটায়, তবে সবাই গোনাহ্‌গার হয়। আজকাল দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মাদ্রাসাসমূহের যে দুরবস্থা তা একমাত্র তারাই জানে, যারা দীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করে এগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। মুসলমানরা জানে যে, যাকাত প্রদান করা তাদের উপর ফরয, তা জানা সত্ত্বেও কম সংখ্যকই পুরোপুরি হিসাব করে পুরোপুরি যাকাত প্রদান করে। তাদের পূর্ণ বিশ্বাস যে, এরপর তাদের কোন আর দায়িত্ব নেই। তারা মসজিদ এবং মাদ্রাসার প্রয়োজনেই যাকাতের অর্থ পেশ করে। অথচ যাকাত ছাড়াই এসব ফরয মুসলমানদের দায়িত্বে আরোপিত। কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত এবং অন্যান্য আরও অনেক আয়াত বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলেছে।

অঙ্গীকারের প্রধান প্রধান দফা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, তোমরা অঙ্গীকার মেনে চললে প্রতিদানে তোমাদের অতীত সব গোনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে এবং তোমাদের চিরস্থায়ী শান্তি ও আরামের জান্নাতে রাখা হবে। পরিশেষে আরও বলা হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি কেউ অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা অবলম্বন করে, তবে সে স্বচ্ছ ও সরল পথ ছেড়ে স্বেচ্ছায় ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত হয়।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا
تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاصْفَحْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى
اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاۗءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۭ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝

(১৩) অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা আমার কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের কোন-না-কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া। অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন। আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন। (১৪) যারা বলে ঃ আমরা নাসারা, আমি তাদের কাছ থেকেও তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। অতঃপর তারা যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, তা থেকে উপকার লাভ করা ভুলে গেল! অতঃপর আমি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কিন্তু বনী ইসরাইল উপরোক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং ভঙ্গ করার পর বিভিন্ন শাস্তিতে পতিত হয়। যেমন, কদাকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়া, লাঞ্ছিত হওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপাদৃষ্টি থেকে তারা যে দূরে সরে পড়ল) শুধু তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে আমি তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে (অর্থাৎ রহমতের ফল থেকে) দূরে নিক্ষেপ করলাম (লা'নত তথা অভিশাপের প্রকৃত অর্থ তাই)। এবং (এই অভিশাপেরই অন্যতম ফল এই যে,) আমি তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিলাম (ফলে তাদের অন্তরে সত্য কথার কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না এবং এই কঠোরতারই অন্যতম ফল এই যে,) তারা (অর্থাৎ তাদের আলিমরা আল্লাহ্র) কালামকে তার (শব্দের অথবা অর্থের) স্থান থেকে পরিবর্তন করে (অর্থাৎ শাব্দিক ও আর্থিক উভয় প্রকার পরিবর্তন করে)। এবং (এই পরিবর্তন করার ফল এই হয়েছে যে, তওরাতে) তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তার একটি বড় অংশ (যা পালন করলে তাদের লাভ হত) বিস্মৃত হয়েছে। (কারণ, মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালতকে সত্য বলে বিশ্বাস করা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুকেই তারা বেশীর ভাগ পরিবর্তন করেছিল। এ বিশ্বাসের চাইতে বড় অংশ আর কি হবে? মোট

কথা, তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ফলে অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে এবং অভিশাপের ফলে অন্তর কঠোর হয়েছে এবং অন্তর কঠোর হওয়ার ফলে তওরাতের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করেছে এবং পরিবর্তন করার ফলে উপদেশের বিরাট অংশ বিস্মৃত হয়েছে ; আর এই ধারাবাহিকতার (এতটুকুতেই শেষ নয় ; বরং অবস্থা এই যে,) আপনি প্রায়ই (অর্থাৎ সর্বদা ধর্মের ক্ষেত্রে) কোন-না-কোন (নতুন) বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন যা তাদের কাছ থেকে প্রকাশ পায়--তাদের সামান্য কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া (যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল)। অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন (অর্থাৎ যতদিন শরীয়তসম্মত প্রয়োজন দেখা না দেয়, ততদিন তাদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন (এবং বিনা প্রয়োজনে লাঞ্ছিত না করা সৎকর্ম)। এবং যারা (ধর্মের সাহায্যের দাবী করে) বলে যে, আমরা নাসারা, আমি তাদের কাছ থেকে তাদের অঙ্গীকার (ইহুদীদের মত) নিয়েছিলাম ; অতএব তারাও (ইঞ্জীল ইত্যাদিতে) তাদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, আর তার একটা বড় অংশ (যা পালন করলে তারা লাভবান হত, কিন্তু) বিস্মৃত হল। (কেননা, তারা যে বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে, তা হচ্ছে একত্ববাদ এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ঈমান। এ বিষয়ে তারাও আদিষ্ট হয়েছিল এবং এটি যে বড় অংশ তা অস্পষ্ট নয়। তারা যখন একত্ববাদ ত্যাগ করে বসল) তখন আমি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি (এটি হচ্ছে জাগতিক সাজা) এবং অতিসত্বর (পরকালে এটিও নিকটবর্তীই) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কৃতকর্ম তাদের সম্পর্কে অবহিত করবেন (অতঃপর শাস্তি দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাইল দুর্ভাগ্যবশত এসব সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করেনি এবং অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিভিন্ন আযাবে নিক্ষেপ করেন।

বনী ইসরাইলের প্রতি কুকর্ম ও অবাধ্যতার ফলে দুই প্রকার আযাব নেমে আসে। এক. বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আযাব। যেমন রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদির বৃষ্টি বর্ষণ, প্রস্তর বর্ষণ, ভূমি উল্টিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো কোরআন পাকের অনেক আয়াতে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

দুই. আত্মিক আযাব। অর্থাৎ অবাধ্যতার ফলে তাদের অন্তর ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। তাতে চিন্তা-ভাবনা ও বোঝার ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ফলে তারা পাপের পরিণামে আরও পাপে লিপ্ত হতে থাকে।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

অর্থাৎ "আমি বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাজা হিসেবে তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিলাম।" ফলে এখন এতে

কোন কিছুর সংকুলান রইল না। রহমত থেকে দূরে সরে পড়া এবং অন্তরের কঠোরতা-কেই সূরা মুতাফ্‌ফিফীনে رَانَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যথা ঃ

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ —অর্থাৎ "কোরআনী আয়াত ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার কারণ এই যে, তাদের অন্তরে পাপের কারণে মরিচা পড়ে গেছে।"

রসূলুল্লাহ্ (সা) এক হাদীসে বলেন ঃ মানুষ প্রথমে যখন কোন পাপ কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি দাগ পড়ে। এর অনিষ্ট সর্বদাই সে অনুভব করে, যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়ে কাল দাগ লেগে গেলে তা দৃষ্টিকে সব সময়ই কষ্ট দেয়। এরপর যদি সে সতর্ক হয়ে তওবা করে এবং ভবিষ্যতে পাপ না করে, তবে এ দাগ মিটিয়ে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে যদি সে সতর্ক না হয় এবং উপর্যুপরি পাপ কাজ করেই চলে, তবে প্রত্যেক গোনাহ্‌র কারণে একটি কাল দাগ বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার অন্তর কাল দাগে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তার অন্তরের অবস্থা ঐ পাত্রের মত হয়ে যায়, যা উপুড় করে রাখা হয় এবং কোন জিনিস রাখলে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে আসে---পরে পাত্রে কিছু থাকে না। ফলে কোন সৎ ও পুণ্যের বিষয় তার অন্তরে স্থান পায় না। তখন তার অন্তর لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا —কোন পুণ্য কাজকে পুণ্য এবং মন্দ কাজকে মন্দ মনে করে না। বরং ব্যাপার উল্টো হয়ে যায়। অর্থাৎ দোষকে গুণ, পুণ্যকে পাপ এবং পাপকে সওয়াব মনে করতে থাকে এবং অবাধ্যতায় বেড়েই চলে। এটা হচ্ছে তার পাপের নগদ সাজা---যা সে ইহকালেই লাভ করে। কোন কোন বুযুর্গ বলেছেন ঃ

ان من جزاء الحسنة الحسنة بعدها - وان من جزاء السيئة السيئة بعدها ـ

অর্থাৎ পুণ্য কাজের একটি তাৎক্ষণিক প্রতিদান এই যে, এরপর সে আরও পুণ্য কাজ করার সামর্থ্য লাভ করে। এমনিভাবে পাপ কাজের একটি তাৎক্ষণিক সাজা এই যে, এক পাপের পর অন্তর আরও পাপের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এতে বোঝা যায় যে, পুণ্য কাজ পুণ্য কাজকে এবং পাপ কাজ পাপ কাজকে আকর্ষণ করে।

বনী ইসরাইলরা অঙ্গীকার ভঙ্গের নগদ সাজা এই লাভ করে যে, মুক্তির সর্বরৃহৎ উপায় আল্লাহ্‌র রহমত থেকে তারা দূরে পড়ে যায় এবং অন্তর এমন পাষাণ হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌র কালামকে তারা স্বস্থান থেকে সরিয়ে দেয় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালামকে পরিবর্তন করে। কখনও শব্দে, কখনও অর্থে এবং কখনও তিলাওয়াতে পরিবর্তন করে। পরিবর্তনের এ প্রকারগুলো কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক খৃস্টানও একথা কিছু কিছু স্বীকার করে। ---(তফসীরে-ওসমানী)

এ আত্মিক সাজার ফলশ্রুতি এই যে, وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهٖ ——অর্থাৎ তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তদ্দ্বারা লাভবান হওয়ার কথা ভুলে গেল। এরপর আল্লাহ্ বলেন ঃ তাদের এ সাজা এমনভাবে তাদের গলার হার হয়ে গেল যে, وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ অর্থাৎ আপনি সর্বদাই তাদের কোন-না-কোন প্রতারণার বিষয় অবগত হতে থাকবেন। اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ অল্প কয়েকজন ছাড়া। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা) প্রমুখ। এঁরা পূর্বে আহ্লে-কিতাব ছিলেন এবং পরে মুসলমান হয়ে যান।

এ পর্যন্ত বনী ইসরাইলের যেসব কুকীর্তি ও অসচ্চরিত্রতা বর্ণিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সাথে ঘৃণা ও অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করতে পারতেন এবং তাদেরকে কাছে আসতেও নিষেধ করতে পারতেন। তাই আয়াতের শেষ বাক্যে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ – ---অর্থাৎ আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের কুকীর্তি মার্জনা করুন। তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের এসব অবস্থা সত্ত্বেও আপনি স্বভাবগত চাহিদা অনুযায়ী পরিচালিত হবেন না। অর্থাৎ ঘৃণাসূচক ব্যবহার করবেন না তথা তাদের কঠোরতা ও অচেতনতার কারণে যদিও ওয়ায এবং উপদেশও কার্যকরী হওয়ার আশা সুদূরপরাহত, তথাপি উদারতা ও সচ্চরিত্রতা এমন পরম পাথর, যার পরশে অচেতনদের মধ্যেও চেতনা সঞ্চারিত হতে পারে। তারা সচেতন হোক বা না হোক, আপনার নিজ চরিত্র ও ব্যবহার ঠিক রাখা জরুরী। সদ্ব্যবহার আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন। এর দৌলতে মুসলমানরা অবশ্যই আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে।

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى ---পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের অঙ্গীকার ভঙ্গকরণ ও শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছিল। এ আয়াতে খৃস্টানদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

খৃস্টান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা খৃস্টানদের অঙ্গীকার ভঙ্গের সাজা বর্ণনা করে বলেছেন যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছে---যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আজকালকার খৃস্টানদের পরস্পর ঐক্যবদ্ধ দেখে আয়াতের সত্যতায় সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। উত্তর এই যে, আয়াতে প্রকৃত খৃস্টানদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যারা ধর্মকর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে গেছে, তারা প্রকৃতপক্ষে খৃস্টানদের তালিকাভুক্ত নয়---

যদিও জাতিগতভাবে তারা নিজেদের খৃস্টান নামেই অভিহিত করে। এখন খৃস্টানদের মধ্যে যদি ধর্মীয় বিদ্বেষ ও পারস্পরিক শত্রুতা না থাকে, তবে তা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, ধর্মের ভিত্তিতেই বিভেদ ও বিদ্বেষ হতে পারত। যখন তাদের ধর্মই নেই, তখন বিভেদ কিসের। যারা ধর্মগত দিক দিয়ে খৃস্টান, আয়াতে তাদের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ খৃস্টানদের মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ সর্বজনবিদিত।

বায়যাভীর টীকায় 'তাইসীর' গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খৃস্টানদের মধ্যে আসলে তিনটি সম্প্রদায় রয়েছে। এক. নিস্তরিয়া। এরা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে। দুই. ইয়াকুবিয়া। এরা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র সাথে এক মনে করে। তিন. মালকাইয়া। এরা ঈসা (আ)-কে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে।

যেখানে মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এত বড় মতানৈক্য, সেখানে পারস্পরিক শত্রুতা অপরিহার্য।

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ
تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۗ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ
مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ
وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ
ابْنُ مَرْيَمَ ۭ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ
الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۭ وَلِلّٰهِ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ
وَاَحِبَّاۗؤُهٗ ۭ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ
خَلَقَ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۡ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

(১৫) হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করছেন। কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। (১৬) এর দ্বারা আল্লাহ্‌ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন। (১৭) নিশ্চয় তারা কাফির, যারা বলে মসীহ্‌ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ্‌। আপনি জিজ্ঞেস করুন, যদি তাই হয় তবে বল—যদি আল্লাহ্‌ মসীহ্‌ ইবনে মরিয়ম, তাঁর জননী এবং ভূমণ্ডলে যারা আছে তাদের সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কারও সাধ্য আছে কি, যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাদেরকে বিন্দুমাত্রও বাঁচাতে পারে? নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে সবকিছুর উপর আল্লাহ্‌ তা'আলারই আধিপত্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপর শক্তিমান। (১৮) ইহুদী ও খৃস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শাস্তি দান করবেন? বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তাতে আল্লাহ্‌রই আধিপত্য রয়েছে এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আহ্‌লে-কিতাব সম্প্রদায় (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টান) তোমাদের কাছে আমার রসূল মুহাম্মদ (সা) আগমন করেছেন (তাঁর জ্ঞানগত উৎকর্ষ এরূপ যে,) কিতাবের যেসব বিষয় (বস্তু) তোমরা গোপন করে ফেল, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় (যা প্রকাশে শরীয়তের কোন উপযোগিতা থাকে---বাহ্যিক জ্ঞানার্জন না করা সত্ত্বেও খাঁটি ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে) তোমাদের সামনে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন এবং (তাঁর জ্ঞানগত ও চরিত্রগত উৎকর্ষ এই যে, তোমরা যা যা গোপন করেছিলে, তার মধ্য থেকে) অনেক বিষয় (জানা সত্ত্বেও শালীনতা প্রদর্শনার্থে প্রকাশ করেন না; বরং) মার্জনা করেন। (কারণ, এগুলো প্রকাশে শরীয়তের কোন উপযোগিতা নেই, বরং তাতে শুধু তোমাদের লাঞ্ছনাই প্রকাশ পায়। এ জ্ঞানগত উৎকর্ষ তাঁর নবী হওয়ার প্রমাণ এবং চরিত্রগত উৎকর্ষ এর সমর্থক। এতে বোঝা গেল যে, অন্যান্য মো'জেযার প্রতি দৃষ্টিপাত না করলেও স্বয়ং তোমাদের সাথে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র ব্যবহার তাঁর নবুয়ত প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। এ রসূলের মাধ্যমেই) তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং (তা হচ্ছে) একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা---যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে---তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন (অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়ার পথ শিক্ষা দেন---সে পথ হচ্ছে বিশেষ বিশেষ বিশ্বাস ও কর্ম। কেননা, প্রকৃতপক্ষে জান্নাতেই পুরোপুরি নিরাপত্তা লাভ সম্ভব। এ নিরাপত্তা হ্রাস পাওয়া ও বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত)। এবং তাদেরকে স্বীয় তৌফিক দ্বারা (কুফর ও পাপের) অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমান ও ইবাদতের জ্যোতির দিকে আনয়ন করেন এবং তাদেরকে (সর্বদা) সরল পথে কায়েম রাখেন। নিশ্চয়ই তারা কাফির

যারা বলে মসীহ্ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ্। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, যদি তাই হয়, তবে বল---যদি আল্লাহ্ তা'আলা মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (যাকে তোমরা হুবহু আল্লাহ্ মনে কর) ও তাঁর জননী (হযরত মরিয়ম) এবং ভূমণ্ডলে যারা আছে, তাদের সবাইকে (মৃত্যু দ্বারা) ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কেউ আছে কি, যে আল্লাহ্র কবল থেকে বিন্দুমাত্রও তাদেরকে বাঁচাতে পারে? (অর্থাৎ এতটুকু তো তোমরাও জান যে, তাঁদেরকে ধ্বংস করার শক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আছে। কাজেই অন্যের হাতে যার প্রাণ, সে কিরূপে আল্লাহ্ হতে পারে? এতে মসীহ্ উপাস্য---এ বিশ্বাস ভ্রান্ত হয়ে গেল) এবং (যিনি সত্যিকার আল্লাহ্ এবং সবার উপাস্য অর্থাৎ) আল্লাহ্ তা'আলা (তাঁর শান এই যে,) তাঁরই বিশেষ আধিপত্য রয়েছে নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তাতে, তিনি যে বস্তুকে (যেভাবে) ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান এবং ইহুদী ও খৃস্টানরা (উভয়েই) বলে ঃ আমরা আল্লাহ্র সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। (উদ্দেশ্যটা যেন এই যে, আমরা যেহেতু পয়গম্বরদের বংশধর, এ কারণে আল্লাহ্র কাছে আমাদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আমরা পাপ করলেও তিনি অতটুকু অসন্তুষ্ট হন না, যতটুকু অন্যে করলে হন। যেমন পুত্রের অবাধ্যতা দেখে পিতার মনে ততটুকু দুঃখ লাগে না, যতটুকু অন্যের অবাধ্যতা দেখে লাগে। তাদের এ অমূলক ধারণা খণ্ডন করার জন্য হযরত (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে,) আপনি (তাদেরকে) জিজ্ঞেস করুন, তবে তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে (আখিরাতে) কেন শাস্তি প্রদান করবেন? (তোমরাও এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখ, যেমন ইহুদীরা বলত ঃ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً —অর্থাৎ আমরা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করলেও গুণাগুণতি কয়েকদিন ভোগ করব। স্বয়ং মসীহ্ (আ)-এর উক্তি কোরআনে বর্ণিত আছে ঃ

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ অর্থাৎ যে লোক আল্লাহ্র সাথে অংশীদার করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন। খৃস্টানদেরই স্বীকারোক্তির অনুরূপ।

মোট কথা, তোমরা নিজেরাও যখন পরকালের শাস্তি স্বীকার কর, তখন বল, কোন পিতা আপন পুত্র অথবা প্রিয়জনকে শাস্তি দেয় কি? সুতরাং নিজেদেরকে আল্লাহ্র সন্তান বলা ভ্রান্ত।

এখানে এরূপ সন্দেহ করা অমূলক যে, মাঝে মাঝে পিতাও সংশোধনের উদ্দেশ্যে পুত্রকে শাস্তি দেন। অতএব শাস্তি দেওয়া পুত্র হওয়ার পরিপন্থী নয়। এর উত্তর এই যে, পিতার শাস্তি চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে---যাতে পুত্র ভবিষ্যতে এরূপ কাজ না করে। পরকাল চরিত্র সংশোধনের স্থান নয়। পরকাল কর্মজগৎ নয়---প্রতিদানের জগৎ। সেখানে ভবিষ্যতে কোন কাজ করার অথবা কোন কাজে বাধা দানের সম্ভাবনা নেই। তাই সেখানে যে শাস্তি হবে, তা খাঁটি শাস্তি। এ শাস্তি সন্তান অথবা প্রিয়জন হওয়ার নিশ্চিত পরিপন্থী। অতএব বোঝা গেল যে, আল্লাহ্র কাছে তোমাদের কোন বিশেষ মর্যাদা নেই। বরং তোমরাও

অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন এবং নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, তাতে আল্লাহ্ তা'আলারই আধিপত্য এবং তাঁর দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন (তাঁকে ছাড়া কোন আশ্রয় নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে খৃস্টানদের একটি উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে---যা তাদের এক দলের ধর্মবিশ্বাসও ছিল। অর্থাৎ হযরত মসীহ (আ) (মাযাল্লাহ) হবহু আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু যে যুক্তি দ্বারা বিষয়টির খণ্ডন করা হয়েছে, তাতে খৃস্টানদের সব দলের একত্ববাদ বিরোধী ভ্রান্ত বিশ্বাসেরই খণ্ডন হয়ে যায়, তা মসীহ (আ)-এর খোদার সন্তান হওয়া সংক্রান্ত বিশ্বাসই হোক অথবা তিন খোদার অন্যতম খোদা হওয়ার বিশ্বাসই হোক।

এস্থলে হযরত মসীহ ও তাঁর জননীকে উল্লেখ করার মধ্যে দু'টি রহস্য থাকতে পারে। এক. আল্লাহ্ তা'আলার সামনে মসীহ (আ)-এর অক্ষমতা যে, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না এবং যে জননীর খিদমত ও হিফাযত তাঁর কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়, সে জননীকে রক্ষা করতে পারেন না। দুই. এতে ঐ সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসও খণ্ডন করা হয়েছে, যারা মরিয়মকে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে।

এস্থলে হযরত মসীহ ও মরিয়মের মৃত্যুকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কোরআন অবতরণের সময় হযরত মরিয়মের মৃত্যু ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ছিল না; বাস্তবেই মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। এর এক কারণ تغليب অর্থাৎ আসলে হযরত মসীহ (আ)-এর মৃত্যুকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর জননীর মৃত্যুকেও একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে---যদিও তাঁর মৃত্যু আগেই হয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একথাও বলা যায় যে, আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আমি মরিয়মকে যেমন মৃত্যুদান করেছি, তেমনি হযরত মসীহ ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের মৃত্যুও আমারই হাতে। يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ বাক্যে খৃস্টানদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণকেও খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা, হযরত মসীহকে খোদা মনে করার আসল কারণ তাদের মতে এই ছিল যে, তিনি জগতের সাধারণ নিয়মের বিপরীতে পিতা ছাড়া শুধু মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি মানুষ হলে নিয়মানুযায়ী পিতামাতা উভয়ের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করতেন।

আলোচ্য বাক্যে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। যেমন, مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ আয়াতে এ সন্দেহই নিরসন করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্র সাধারণ নিয়মের বাইরে মসীহ (আ)-কে সৃষ্টি করা তার খোদা হওয়ার প্রমাণ হতে পারেন।

লক্ষণীয় যে, হযরত আদম (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা পিতা ও মাতা উভয়ের মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সব কিছুই করতে পারেন। তিনিই স্রষ্টা, প্রভু ও ইবাদতের যোগ্য। অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়।

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا۟ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

(১৯) হে আহ্লে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রসূল আগমন করেছেন, যিনি পয়গম্বরদের বিরতির পর তোমাদের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন—যাতে তোমরা একথা বলতে না পার যে, আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আগমন করেন নি। অতএব, তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক এসে গেছেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আহ্লে-কিতাব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে আমার রসূল [মুহাম্মদ (সা)] আগমন করেছেন, যিনি তোমাদের (শরীয়তের বিষয়াদি) পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন—এমন সময় যে, পয়গম্বরদের (আগমনের) পরম্পরা (বহুদিন থেকে বন্ধ ছিল এবং পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পয়গম্বরদের আগমন পরম্পরা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার কারণে সেসব বিলুপ্ত হয়ে শরীয়তগুলোর পুনরুত্থান সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। তাই তখন একজন পয়গম্বরের আগমন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। এহেন সময়ে তাঁর আগমনকে একটি বড় নিয়ামত ও আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের দান বলে মনে করা উচিত) যাতে তোমরা (কিয়ামতের দিন) এরূপ বলতে না পার (যে, ধর্মের কাজে ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমার্হ। কেননা,) আমাদের কাছে (এমন কোন রসূল, যিনি) সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক (হবেন এবং যার দ্বারা আমরা ধর্মের জ্ঞান ও কর্মে অনুপ্রাণিত হতাম) আগমন করেন নি। (কিন্তু, এখন আর এরূপ বাহানার অবকাশ নেই। কেননা, তোমাদের কাছে) সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক [অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)] এসে গেছেন (এখন যদি তাঁকে মেনে না চল, তবে নিজ পরিণামের কথা ভেবে দেখ)। আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপর পূর্ণ শক্তিমান। (যখন ইচ্ছা রহমতবশত স্বীয় পয়গম্বরদের প্রেরণ করেন এবং যখন ইচ্ছা রহস্যবশত তাঁদের আগমন বন্ধ রাখেন। এতে কারও এমন মনে করার অধিকার নেই যে, দীর্ঘদিন যাবত যখন পয়গম্বরদের আগমন বন্ধ রয়েছে, তখন আর কোন পয়গম্বর আসতে পারবেন না। কেননা, পয়গম্বরদের আগমন দীর্ঘদিন বন্ধ রাখার বিষয়টি ছিল আল্লাহ্র রহস্যের ব্যাপার। তিনি নবীদের আগমন বন্ধ ও শেষ করে দেওয়ার ঘোষণা তখন পর্যন্ত করেন নি। বরং বিগত সব

পয়গম্বরের মাধ্যমে এ সংবাদই দিয়েছিলেন যে, শেষ যমানায় একজন বিশেষ রসূল বিশেষ শান ও বিশেষ গুণাবলীসহ আগমন করবেন। তাঁর মাধ্যমেই নবুয়ত সমাপ্তি লাভ করবে। এ ঘোষণা মোতাবেকই শেষ নবী মুহাম্মদ [সা] আগমন করেছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ — فترت---এর শাব্দিক অর্থ মন্থর হওয়া, অনড় হওয়া এবং কোন কাজকে বন্ধ করে দেওয়া। আলোচ্য আয়াতে তফসীরবিদরা فترت এর শেষোক্ত অর্থই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ পয়গম্বরদের আগমন পরম্পরা কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকা। হযরত ঈসার পর শেষ নবী (সা)-র নবুয়ত লাভের সময় পর্যন্ত যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, তাই فترت- -এর যমানা।

فترت- -এর যমানা কতটুকু ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-র মাঝখানে এক হাজার সাত শ' বছরের ব্যবধান ছিল। এ সময়ের মধ্যে পয়গম্বরদের আগমন একাদিক্রমে অব্যাহত ছিল। এতে কখনও বিরতি ঘটেনি। শুধু বনী ইসরাইলের মধ্য থেকেই এক হাজার পয়গম্বর এ সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। বনী ইসরাইল ছাড়া অন্য গোত্র থেকেও অনেক পয়গম্বর আগমন করেছিলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-র জন্ম ও রসূলুল্লাহ (সা)-র নবুয়ত লাভের মাঝখানে মাত্র পাঁচশ' বছরকাল পয়গম্বরদের আগমন বন্ধ ছিল। এ সময়টিকেই فترت তথা বিরতির সময় বলা হয়। এর আগে কখনও এত দীর্ঘ সময় পয়গম্বরদের আগমন বন্ধ ছিল না।---(কুরতুবী)

হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল এবং হযরত ঈসা ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল, সে সম্পর্কে আরও বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, যাতে সময়ের পরিমাণ কমবেশী বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এতে আসল উদ্দেশ্যে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না।

ইমাম বোখারী হযরত সালমান ফারসীর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন ঃ হযরত ঈসা ও শেষ নবী (সা)-র মাঝখানে সময় ছিল ছয়'শ বছর। এ সময়ের মধ্যে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হন নি। বোখারী ও মুসলিমের বরাত দিয়ে মিশকাতে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ انا اولى الناس بعيسى অর্থাৎ আমি ঈসা (আ)-র সবচাইতে নিকটবর্তী। এর মর্ম হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে ليس بيننا نبى অর্থাৎ আমাদের মাঝখানে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হন নি।

সূরা ইয়াসীনে যে তিনজন 'রসূলের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক প্রেরিত দূত ছিলেন। আভিধানিক অর্থেই তাঁদেরকে 'রসূল' বলা হয়েছে।

বিরতির সময়ে খালেদ ইবনে সিনান নবী ছিলেন বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে তফসীরে রূহুল-মা'আনীতে শিহাবের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন ঠিক, কিন্তু তাঁর নবুয়তকাল ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের পূর্বে---পরে নয়।

অন্তর্বর্তীকালের বিধান ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, যদি কোন সম্প্রদায়ের কাছে কোন রসূল, পয়গম্বর অথবা তাদের কোন প্রতিনিধি আগমন না করে এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের শরীয়তও তাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকে, তবে তারা শিরক ছাড়া অন্য কোন কুকর্ম ও গোমরাহীতে লিপ্ত হলে তা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তারা আযাবের যোগ্য হবে না। এ কারণেই অন্তর্বর্তীকালের লোকদের সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে কি না।

অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদ বলেন ঃ তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে বলেই আশা করা যায়, যদি তারা নিজেদের ঐ ধর্ম অনুসরণ করে, যা ভুলভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থায় হযরত ঈসা অথবা মূসা (আ)-র সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে তাদের কাছে এসেছিল। তারা একত্ববাদের বিরুদ্ধাচরণ ও শিরকে লিপ্ত হলে একথা প্রযোজ্য হবে না। কেননা একত্ববাদ কোন পয়গম্বরের পথপ্রদর্শনের অপেক্ষা রাখে না। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করে নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ তা জেনে নিতে পারে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে যেসব ইহুদী ও খৃস্টানকে সম্বোধন করা হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালে তাদের কাছে কোন রসূল আগমন না করলেও তাওরাত ও ইঞ্জীল তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাদের আলিম সম্প্রদায়ও ছিল। এমতাবস্থায় "আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক পৌঁছেনি" বলে তাদের ওযর পেশ করার কোন যুক্তি ছিল কি? উত্তর এই যে, হযরত রসূলে করীম (সা)-এর আমল পর্যন্ত তাওরাত ও ইঞ্জীল অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে তাতে মিথ্যা ও বানোয়াট কিসসা-কাহিনী অনুপ্রবেশ করেছিল। কাজেই তা থাকা-না-থাকা সমান ছিল। ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ আলিমের বর্ণনা অনুযায়ী তাওরাতের আসল কপি কারও কাছে কোন অজ্ঞাত স্থানে বিদ্যমান থাকলেও তা এর পরিপন্থী নয়।

শেষ নবীর বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত ঃ "আমার রসূল মুহাম্মদ (সা) দীর্ঘ বিরতির পর আগমন করেছেন"---আলোচ্য আয়াতে আহ্‌লে-কিতাবদের সম্বোধন করে একথা বলার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের উচিত তাঁর আগমনকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিরাট দান ও বড় নিয়ামত মনে করা। কেননা, পয়গম্বরের আগমন সুদীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। এখন তোমাদের জন্য তা আবার খোলা হয়েছে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এদিকেও রয়েছে যে, তার আগমন এমন এক যুগে ও এমন স্থানে হয়েছে, যেখানে জ্ঞান ও ধর্মের কোন আলো ছিল না। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানব আল্লাহ্‌র সাথে পরিচয় হারিয়ে মূর্তিপূজায় মনোনিবেশ করেছিল। এমন জাহিলিয়াতের যুগে এহেন পথভ্রষ্ট জাতির সংশোধন করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তাঁর সংসর্গের কল্যাণে

ও নবুয়তের জ্যোতির পরশে অল্প দিনের মধ্যেই এ জাতি সমগ্র বিশ্বের জন্য জ্ঞান-গরিমা, কর্মপ্রেরণা, সচ্চরিত্রতা, লেনদেন, সামাজিকতা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও তাঁর পয়গম্বরসুলভ শিক্ষা যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের চাইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। যে ডাক্তার কোন চিকিৎসা থেকে নিরাশ রোগীর চিকিৎসা এমন জায়গায় করে, যেখানে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্রও দুর্লভ, অতঃপর তাঁর সফল চিকিৎসায় মুমূর্ষু রোগী শুধু আরোগ্য লাভই করে না, বরং একজন বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকও হয়ে যায়, এমন ডাক্তারের শ্রেষ্ঠত্বে কারও মনে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

সুদীর্ঘ বিরতির পর যখন চারদিকে অন্ধকার বিরাজ করছিল, তখন তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চতুর্দিককে এমন আলোকোদ্ভাসিত করে তোলে যে, অতীত যুগে এর দৃষ্টান্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব সব মো'জেযা একদিকে রেখে একা এ মো'জেযাটিই মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করতে পারে।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا
مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ
اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا
يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا
مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ
يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ
فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا
يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ
رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا
نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا
مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ فَلَا

تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

(২০) যখন মূসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে পয়গম্বর সৃষ্টি করেছিলেন। তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেন নি। (২১) হে আমার সম্প্রদায়! পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (২২) তারা বলল ঃ হে মূসা! সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব। (২৩) আল্লাহ্-ভীরুদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি বলল ঃ যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন, তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। (২৪) আর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (২৫) তারা বলল ঃ হে মূসা! আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ই যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম। (২৬) মূসা বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। (২৭) বললেন ঃ এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য হারাম করা হল। তারা ভূপৃষ্ঠে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর সে সময়টির কথাও (স্মরণযোগ্য), যখন মূসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে (অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে প্রথম জিহাদের প্রতি উৎসাহদানের ভূমিকায়) বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে পয়গম্বর সৃষ্টি করেছেন [যেমন হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ, স্বয়ং হযরত মূসা, হযরত হারূন (আ) প্রমুখ। কোন সম্প্রদায়ে পয়গম্বর হওয়া নিঃসন্দেহে একটি জাগতিক ও ধর্মীয় সম্মান। আর এ নিয়ামতটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক।] এবং (বাহ্যিক নিয়ামত এই দিয়েছেন যে), তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন (সেমতে এই মুহূর্তে ফিরাউনের দেশ অধিকার করে রয়েছ) এবং তোমাদেরকে (কিছু কিছু এমন জিনিস দান করেছেন, যা বিশ্ব জগতের আর কাউকে দান করেন নি। যেমন, সমুদ্রে পথ দেওয়া, শত্রুকে অভিনব পন্থায় নিমজ্জিত করা, যদ্দরুন চরম লাঞ্ছনা ও কষ্টের কবল থেকে তোমরা অকস্মাৎ শান্তির স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে গিয়েছ। অর্থাৎ এ ব্যাপারে তোমাদেরকে

বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। এ ভূমিকার পর তাদেরকে সম্বোধন করে আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন ঃ) হে আমার সম্প্রদায় (এসব নিয়ামত ও অনুগ্রহের দাবী এই যে, তোমরা আল্লাহ্-নির্দেশিত এ জিহাদে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হও এবং) সেই পবিত্র ভূমিতে (অর্থাৎ সিরিয়ার রাজধানীতে জিহাদের উদ্দেশ্যে) প্রবেশ কর (যেখানে আমালেকা সম্প্রদায় ক্ষমতাসীন রয়েছে)। যা আল্লাহ্ তোমাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন (তাই ইচ্ছা করলেই তোমরা জয়লাভ করবে) এবং পশ্চাতে (দেশের দিকে) প্রত্যাবর্তন করো না; অন্যথায় তোমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (ইহকালেও এবং পরকালেও। পরকালের ক্ষতি এই যে, জিহাদের ফরয পরিত্যাগ করার কারণে গোনাহ্গার হয়ে যাবে)। তারা বলল ঃ হে মূসা! সেখানে তো একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা সেখানে কখনও পা রাখব না, যে পর্যন্ত না তারা (কোনরূপে) সেখান থেকে বের হয়ে যায়। হাঁ, যদি তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও চলে যায়, তবে নিশ্চিতই আমরা যেতে প্রস্তুত রয়েছি। [মূসা (আ)-র উক্তি সমর্থন করার জন্য] ঐ দুই ব্যক্তি (এবং) যারা (আল্লাহ্) ভীরুদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (এবং) যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন (এভাবে যে. তারা অঙ্গীকারে অটল ছিলেন এসব কাপুরুষকে বোঝাবার জন্য বললেন ঃ তোমরা তাদের উপর (আক্রমণ করে এই শহরের) দ্বার পর্যন্ত চল। যখন তোমরা নগর দ্বারে পা রাখবে, তখনই জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ দ্রুত জয়লাভ করতে পারবে। শত্রুরা ভয়ে পলায়ন করুক অথবা সামান্য মুকাবিলা করতে হোক) এবং আল্লাহ্র প্রতি দৃষ্টি রাখ, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (অর্থাৎ শত্রুর বিরাট শক্তির প্রতি দৃষ্টি দিও না। কিন্তু এসব উপদেশের কোন প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে দেখা গেল না, বরং এ ব্যক্তিদ্বয়কে তারা সম্বোধনেরও যোগ্য মনে করল না; বরং মূসা আলায়হিস সালামকে চরম ধৃষ্টতা সহকারে) বলতে লাগল ঃ হে মূসা! (আমাদের একই কথা,) আমরা কখনও সেখানে পা রাখব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। (যদি যুদ্ধ করার এতই সাধ থাকে), তবে আপনি ও আপনার আল্লাহ্ চলে যান এবং উভয়ে গিয়ে যুদ্ধ করুন। আমরা তো এখান থেকে নড়ছি না। মূসা (আ) (খুবই বিরক্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে) দোয়া করতে লাগলেন ঃ হে পালনকর্তা! (আমি কি করব—তাদের ওপর আমার হাত নেই) হাঁ, নিজের ওপর এবং নিজ ভাইয়ের ওপর অবশ্য (পুরোপুরি) ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের (ভ্রাতৃদ্বয়ের) মধ্যে এবং এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে (উপযুক্ত) ফয়সালা করে দিন। (অর্থাৎ যার অবস্থা যা চায়, তাই তাকে প্রদান করুন) ইরশাদ হল, (উত্তম! আমার ফয়সালা এই যে,) এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের করায়ত্ত হবে না (এবং তারা স্বগৃহেও যেতে পারবে না—পথই পাবে না।) এমনিভাবেই (চল্লিশ বছর পর্যন্ত) ভূপৃষ্ঠে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। [হযরত মূসা (আ) এ ধারণাতীত ফয়সালা শুনে স্বভাবতই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ, তিনি আরও লঘু সিদ্ধান্তের আশা করেছিলেন। তাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইরশাদ হল ঃ হে মূসা, এ উদ্ধত সম্প্রদায়ের জন্য আমি যে ফয়সালা দিয়েছি তাই উপযুক্ত।] অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের (এ দুরবস্থার) জন্য (মোটেই) বিষণ্ণ হবেন না!

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী এক আয়াতে সেই অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের আনুগত্যের ব্যাপারে বনী ইসরাইলের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। এর সাথে সাথে তাদের সাধারণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকরণ, অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ এবং তার শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের একটি বিশেষ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে।

ঘটনাটি এই যে, ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত হল এবং মূসা (আ) ও তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাইল ফিরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে মিসরের আধিপত্য লাভ করল তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেই সঙ্গে তাদেরকে আরো কিছু নিয়ামত এবং তাদের পৈতৃক দেশ সিরিয়াকেও তাদের অধিকারে প্রত্যর্পণ করতে চাইলেন। সেমতে মূসা আলায়হিস সালামের মাধ্যমে তাদেরকে জিহাদের উদ্দেশ্যে পবিত্র ভূমি সিরিয়ায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হল। সাথে সাথে তাদেরকে আগাম সুসংবাদও দেওয়া হল যে, এ জিহাদে তারাই বিজয়ী হবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ পবিত্র ভূমির আধিপত্য তাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন, যা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু বনী ইসরাইল স্বভাবগত হীনতার কারণে আল্লাহ্র বহু নিয়ামত তথা ফিরাউনকে নিমজ্জিত করা, মিসর অধিকার করা ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখেও এক্ষেত্রে অঙ্গীকার প্রতিপালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে সক্ষম হল না। তারা সিরিয়ার জিহাদ সম্পর্কিত আল্লাহ্ তা'আলার এ নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় জেদ করে বসে রইল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর কঠোর শাস্তি নাযিল করলেন। পরিণতিতে তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় অবরুদ্ধ ও বন্দী হয়ে রইল। বাহ্যত তাদের চতুষ্পার্শ্বে কোন বাধার প্রাচীর ছিল না এবং তাদের হাত-পাও শিকলে বাঁধা ছিল না, বরং তারা ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে। তারা স্বদেশে অর্থাৎ মিসরে ফিরে যাবার জন্য প্রতিদিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত পথও চলত, কিন্তু বিকেলে তারা নিজেদেরকে সেখানেই দেখতে পেত, যেখান থেকে সকালে রওয়ানা হয়েছিল। ইত্যবসরে হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর ওফাত হয়ে যায় এবং বনী ইসরাইল তীহ্ প্রান্তরেই উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরাফিরা করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হিদায়েতের জন্য অন্য একজন পয়গম্বর প্রেরণ করলেন।

এমনিভাবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বনী ইসরাইলের অবশিষ্ট বংশধর তৎকালীন পয়গম্বরের নেতৃত্বে সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের জন্য জিহাদের সংকল্প গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদাও পূর্ণতা লাভ করে। এ হচ্ছে আয়াতে বর্ণিত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এবার কোরআনের ভাষায় বিস্তারিত ঘটনা শুনুন ঃ

হযরত মূসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বায়তুল-মুকাদ্দাস ও সিরিয়া দখল করার আল্লাহ্র নির্দেশ শোনাবার পূর্বে পয়গম্বরসুলভ বিচক্ষণতা ও উপদেশদানের পরিপ্রেক্ষিতে বনী ইসরাইলকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন ঃ

اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا

وَّاٰتٰكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ০

অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে স্মরণ কর। তিনি তোমাদের মধ্যে অনেক পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, তোমাদেরকে রাজ্যের অধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন নিয়ামত দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কেউ পায়নি।

এতে তিনটি নিয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমটি একটি আধ্যাত্মিক নিয়ামত; অর্থাৎ তাঁর সম্প্রদায়ে অব্যাহতভাবে বহু সংখ্যক পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন। এর চাইতে বড় পারলৌকিক সম্মান আর কিছু হতে পারে না। তফসীরে মযহারীতে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাইলের মত এত অধিক সংখ্যক পয়গম্বর অপর কোন উম্মতে হয়নি।

হাদীসবিদ ইবনে আবী হাতেম আ'মাশের রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণনা করেন যে, বনী ইসরাইলদের শেষ পর্বে যা হযরত মূসা আলায়হিস সালাম থেকে শুরু করে হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়, তাতেই এ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক হাজার পয়গম্বর প্রেরিত হন। আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় নিয়ামতটি হচ্ছে জাগতিক ও বাহ্যিক। অর্থাৎ তাদেরকে রাজ্যাধিপতি করে দেওয়া হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনী ইসরাইল সুদীর্ঘ কাল থেকে ফিরাউন ও ফিরাউন বংশীয়দের ক্রীতদাসরূপে দিনরাত অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। আজ আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউন ও তার বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে বনী ইসরাইলকে তার রাজ্যের অধিপতি করে দিয়েছেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, পয়গম্বরদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ جعل فيكم انبياء অর্থাৎ তোমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে অনেককে পয়গম্বর করেছেন। এর অর্থ এই যে, সমগ্র জাতি পয়গম্বর ছিল না। বাস্তব সত্যও তাই। পয়গম্বর অনেকের মধ্যে কয়েকজনই হন। অবশিষ্ট গোটা জাতি তাদের উম্মত ও অনুসারী হয়। কিন্তু এখানে জাগতিক রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করেতে গিয়ে বলা হয়েছে وجعلكم ملوكا অর্থাৎ তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করে দিয়েছেন। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমাদের সবাইকে রাজা করে দিয়েছেন। ملوك শব্দটি ملك এর বহুবচন। সাধারণ পরিভাষায় এর অর্থ অধিপতি, বাদশাহ, রাজা। একথা সবাই জানে যে, গোটা জাতি যেমন নবী ও পয়গম্বর হয় না, তেমনি কোন দেশে গোটা জাতি বাদশাহ বা রাজা হয় না। বরং জাতির এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তি শাসনকার্য পরিচালনা করে। অবশিষ্ট জাতি তাদের অধীনস্থ হয়ে থাকে। কিন্তু কোরআনের ভাষায় তাদের সবাইকে বাদশাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর একটি কারণ বয়ানুল কোরআনের কোন বুযুর্গের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, কোন জাতির মধ্য থেকে কেউ বাদশাহ্ হলে সাধারণ পরিভাষায় তার রাজত্ব ও সাম্রাজ্যকে গোটা জাতির দিকে সম্বন্ধ করা হয়। উদাহরণত ইসলামের মধ্য যুগের বাদশাহ্‌দের রাজত্বকে বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসের রাজত্ব বলা হয়। এমনিভাবে ভারতবর্ষে গযনবী বংশের রাজত্ব, ঘোরী বংশের রাজত্ব, মোঘল বংশের রাজত্ব, অতঃপর ইংরেজদের

রাজত্বকে সমগ্র জাতির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই যে জাতির একজন বাদশাহ্ হয়, সে জাতির সবাইকে বাদশাহ্ বলে দেওয়া হয়।

এই বিশেষ বাচনভঙ্গি অনুযায়ী কোরআন পাক সমগ্র বনী ইসরাইলকে রাজ্যাধিপতি বলে দিয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে জনগণের রাষ্ট্র। জনগণই স্বীয় রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করার অধিকারী এবং জনগণই সম্মিলিত মত দ্বারা তাঁকে অপসারণও করতে পারে। তাই দেখার ক্ষেত্রে যদিও একজন রাষ্ট্রপ্রধান হন, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক জনগণই।

দ্বিতীয় কারণটি ইবনে-কাসীর ও তফসীরে মযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্ববর্তী কোন মনীষী থেকে বর্ণিত রয়েছে। তা হল এই যে, ملک শব্দটির অর্থ শুধু রাজাই নয়, বরং আরও ব্যাপক। গাড়ী, বাড়ী ও নওকর-চাকরের অধিকারী স্বাচ্ছন্দ্যশীল ব্যক্তিকেও ملک বলা হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে তখন বনী ইসরাইলের প্রত্যেক ব্যক্তিই ملک ছিল। তাই তাদের সবাইকে ملوک বলা হয়েছে।

তৃতীয় নিয়ামত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার নিয়ামতের সমষ্টি। বলা হয়েছে ঃ وَاٰتٰكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ—অর্থাৎ তোমাদেরকে এমন সব নিয়ামত দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেন নি। অভ্যন্তরীণ সম্মান, নবুয়ত এবং রিসালতও এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া বাহ্যিক রাজত্ব এবং অর্থ-সম্পদও এরই মধ্যে পরিগণিত। প্রশ্ন হতে পারে, কোরআনের উক্তি অনুযায়ী মুসলিম সম্প্রদায় অন্য সব উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কোরআনের উক্তি كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ

এবং كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا প্রভৃতি বাক্য এবং অসংখ্য لِلنَّاسِ হাদীসও এ বক্তব্য সমর্থন করে। উত্তর এই যে, আয়াতে বিশ্বজগতের ঐ সব লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা মূসা (আ)-র আমলে বিদ্যমান ছিল। তখন সমগ্র বিশ্বের কেউ ঐ সব নিয়ামত পায়নি, যা বনী ইসরাইল পেয়েছিল। পরবর্তী যুগের কোন উম্মত যদি আরও বেশী নিয়ামত লাভ করে, তবে তা আয়াতের পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বর্ণিত মূসা (আ)-র উক্তিটি ঐ নির্দেশ বর্ণনার ভূমিকা, যা পরবর্তী আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা সে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভাগ্যে লিখেছেন।

পবিত্র ভূমি বলে কোন্ ভূমি বোঝানো হয়েছে ঃ এ প্রশ্নে তফসীরবিদদের উক্তি বাহ্যত ভিন্ন ভিন্ন। কারও মতে বায়তুল-মুকাদ্দাস, কারও মতে কুদ্‌স শহর ও ইলিয়া এবং কেউ কেউ বলেন ঃ আরিহা শহর —যা জর্দান নদী ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের মধ্যস্থলে বিশ্বের একটি প্রাচীনতম শহর যা পূর্বেও ছিল এবং এখনও আছে। হযরত মূসা (আ)-র আমলে এ শহরের অত্যাশ্চর্য জাঁকজমক ও বিস্তৃতি ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, এ শহরের এক হাজার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছিল। প্রতি অংশে এক হাজার করে বাগান ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, পবিত্র ভূমি বলে দামেশ্‌ক ও ফিলিস্তীনকে এবং কারও মতে জর্দানকে বোঝানো হয়েছে। হযরত কাতাদাহ্ বলেন—সমগ্র সিরিয়াই পবিত্র ভূমি। কা'ব আহবার বলেন, আমি আল্লাহ্‌র কিতাবে (সম্ভবত তৌরাতে) দেখেছি যে, সমগ্র সিরিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ ধনভাণ্ডার রয়েছে এবং এতে আল্লাহ্‌র অনেক প্রিয় বান্দা রয়েছেন। পয়গম্বরদের জন্মস্থান ও বাসস্থান হওয়ার কারণে একে পবিত্র ভূমি বলা হয়।

এক রেওয়ায়েতে আছে, একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) লেবাননের পাহাড়ে আরোহণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন—ইবরাহীম! এখান থেকে দৃষ্টিপাত কর। যে পর্যন্ত তোমার দৃষ্টি পৌঁছাবে, আমি তার সবটুকুকে পবিত্র ভূমি করে দিলাম। ইবনে-কাসীর ও মযহারী তফসীর গ্রন্থ থেকে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সর্বশেষ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সমগ্র সিরিয়াই পবিত্র ভূমি। তবে বর্ণনায় কেউ সিরিয়ার অংশ বিশেষকে এবং কেউ সমগ্র সিরিয়াকে বর্ণনা করেছেন।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى—এর আগে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-র মাধ্যমে বনী ইসরাইলকে আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করে সিরিয়া দখল করতে বলেছিলেন। সাথে সাথে এ সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, সিরিয়ার ভূখণ্ড তাদের ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে। কাজেই তাদের বিজয় সুনিশ্চিত।

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সত্ত্বেও বনী ইসরাইল স্বীয় সর্বজনবিদিত ঔদ্ধত্য ও বক্র স্বভাবের কারণে এ নির্দেশ পালনে স্বীকৃত হল না, বরং মূসা (আ)-কে বলল—হে মূসা! এ দেশে প্রবল পরাক্রান্ত জাতি বাস করে। যতদিন এ দেশ তাদের দখলে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। হাঁ, যদি তারা অন্য কোথাও চলে যায়, তবে আমরা সেখানে যেতে পারি।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, ইকরিমা, আলী ইবনে আবী তালহা প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তখন সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাস আমালেকা সম্প্রদায়ের দখলে ছিল। তারা ছিল আদ সম্প্রদায়ের একটি শাখা। দৈহিক দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত সুঠাম, বলিষ্ঠ ও ভয়াবহ আকৃতি বিশিষ্ট ছিল। তাদের সাথে জিহাদ করে বায়তুল-মুকাদ্দাস অধিকার করার নির্দেশ মূসা আলায়হিস সালাম ও তাঁর সম্প্রদায়কে দেওয়া হয়েছিল।

মূসা আলায়হিস সালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের জন্য বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হলেন। উদ্দেশ্য ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছা। জর্দান নদী পার হয়ে বিশ্বের প্রাচীনতম শহর আরিহায় পৌঁছে তিনি শিবির স্থাপন করলেন। বনী ইসরাইলদের দেখা-শোনার জন্য বার জন সর্দার নির্বাচন করার কথা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মূসা (আ) এই বার জন সর্দারকে শত্রুদের অবস্থা ও রণাঙ্গনের হাল-হাকীকত জেনে আসার জন্য সম্মুখে প্রেরণ করলেন। বায়তুল-মুকাদ্দাসের অদূরে শহরের বাইরে আমালেকা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির সাথে তাদের দেখা হয়। সে একাই বার জনকে গ্রেফতার করে বাদশাহ্‌র সামনে উপস্থিত করে বলল ঃ এরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছে। শাহী দরবারে পরামর্শ হল যে, এদেরকে হত্যা করা হোক অথবা অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা হোক। অবশেষে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল—যাতে তারা স্বজাতির কাছে পৌঁছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমালেকা জাতির শৌর্য-বীর্যের কাহিনী বর্ণনা করে। ফলে আক্রমণ তো দূরের কথা, ভীত হয়ে এদিকে মুখ করার সাহসও তারা হারিয়ে ফেলে।

এ স্থলে অধিকাংশ তফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত ইসরাইলী রেওয়ায়েতসমূহে নাতিদীর্ঘ কিসসা-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং আমালেকা সম্প্রদায়ের উল্লিখিত ব্যক্তির নাম বলা হয়েছে আওজ ইবনে ওনুক। এসব রেওয়ায়েতে তার অদ্ভুত আকার-আকৃতি ও শক্তি-সাহসকে এমন অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে উদ্ধৃত করাও কঠিন।

ইবনে-কাসীর বলেন ঃ আওজ ইবনে ওনুকের যেসব কিসসা এসব ইসরাইলী রেওয়ায়েতে স্থান পেয়েছে, সেগুলো কোন বুদ্ধিমানের কাছে গ্রহণীয় নয় এবং শরীয়তেও এগুলোর কোন বৈধতা নেই—এ সবই মিথ্যা ও বানোয়াট। আসল ব্যাপার এতটুকু যে, আমালেকা সম্প্রদায় ছিল আদ সম্প্রদায়ের উত্তর পুরুষদের একটি অংশ। আদ সম্প্রদায়ের ভয়াবহ আকার-আকৃতির কথা স্বয়ং কোরআন পাক বর্ণনা করেছে। তাদের বিশালাকৃতি ও শক্তি-সাহস প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের এক ব্যক্তি বনী ইসরাইলের বার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

মোট কথা, বনী ইসরাইলের বার জন সর্দার আমালেকাদের কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়ে আরিহায় স্বজাতির কাছে ফিরে এল। তারা মূসা (আ)-র কাছে এ বিস্ময়কর জাতি ও তাদের অবিশ্বাস্য শৌর্যবীর্যের কাহিনী বর্ণনা করল। হযরত মূসা (আ) এসব কাহিনী শুনে এতটুকুও ভীত হলেন না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বিজয় ও সাফল্যের বাণী শুনিয়ে রেখেছিলেন। আকবর এলাহাবাদীর ভাষায় ঃ

مجھ کو بے دِل کرے ایسا کون ہے
یاد مجھ کو انتم الاعلون ہے

হযরত মূসা (আ) তো তাদের শৌর্যবীর্যের অবস্থা শুনে স্বস্থানে পাহাড়ের মত দৃঢ়তা সহকারে জিহাদের প্রস্তুতিতে লেগে রইলেন। কিন্তু বনী ইসরাইলকে নিয়েই সমস্যা। তারা

যদি প্রতিপক্ষের অসাধারণ শক্তি-সাহসের কথা জেনে ফেলে, তবে নিশ্চিতই ভরাডুবি! তাই তিনি বার জন সর্দারকে আমালেকা সম্প্রদায়ের অবস্থা বনী ইসরাইলের কাছে ব্যক্ত করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু তা হল না। তারা প্রত্যেকেই গোপনে গোপনে বন্ধু-বান্ধবের কাছে তা ব্যক্ত করে দিল। শুধু ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকান্না নামক দু'ব্যক্তি মূসা (আ)-র নির্দেশ পালন করে তা কারও কাছে প্রকাশ করল না।

বারজনের মধ্যে দশজনই যদি গোপন রহস্য প্রকাশ করে দেয়, তবে তা গোপন থাকার কথা নয়। ফলে এমন সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে বনী ইসরাইলরা কান্নাকাটি জুড়ে দিল। তারা বলতে লাগল ঃ ফিরাউনের সম্প্রদায়ের মত সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া এর চাইতে অনেক ভাল ছিল। সেখান থেকে উদ্ধার করে এনে আমাদেরকে এখানে নিশ্চিত ধ্বংসের সম্মুখীন করা হয়েছে। এসব অবস্থার পটভূমিকায় বনী ইসরাইল বলেছিল ঃ

يَا مُوسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا -

অর্থাৎ হে মূসা ! এ শহরে একটি দুর্ধর্ষ জাতি বসবাস করে। তাদের মোকাবিলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই যতক্ষণ তারা সেখানে আছে, ততক্ষণ আমরা সেখানে যাওয়ার নামও নেব না। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যে দুই ব্যক্তি ভয় করত এবং যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ামত দান করেছিলেন, তারা এসব কথাবার্তা শুনে বনী ইসরাইলকে উপদেশছলে বলল ঃ তোমরা আগেই ভয়ে মরছ কেন? একটু পা বাড়িয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস শহরের ফটক পর্যন্ত পৌঁছ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এতটুকুতেই তোমরা বিজয়ী হয়ে যাবে এবং শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবে। অধিকাংশ তফসীর-বিদের মতে আয়াতে বর্ণিত এ দু'ব্যক্তি হচ্ছে বার জনের মাঝে সেই দুই সর্দার, যারা মূসা (আ)-র নির্দেশক্রমে আমালেকার অবস্থা গোপন রেখেছিলেন অর্থাৎ ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকান্না।

কোরআন পাক এ স্থলে তাদের দু'টি গুণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে। এক اَلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ অর্থাৎ যারা ভয় করত। কাকে ভয় করত, আয়াতে তার উল্লেখ নেই। এতে করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশ্ব-চরাচরে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ভয় করার যোগ্য পাত্র। কেননা, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ তাঁরই কব্জায়। তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া কেউ কারও সামান্য উপকারও করতে পারে না এবং সামান্য ক্ষতিও করতে পারে না। নির্দিষ্ট একটি সত্তাই যখন ভয় করার একমাত্র যোগ্য, তখন তা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় গুণ এই ঃ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে

নিয়ামত দান করেছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যার মধ্যে যে গুণ ও আত্মিক সৌন্দর্য রয়েছে, তা সবই আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও দান। নতুবা বারজন সর্দারের মধ্যে দশজনই বাহ্যিক শক্তি তথা হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি তথা জ্ঞান, বুদ্ধি, চেতনা সর্বোপরি মূসা (আ)-র সংসর্গ লাভ করা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু তাঁরা দুজনই সত্যের পথে অটল রইলেন। এতে বোঝা যায় যে, আসল হিদায়েত মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শক্তি, চেষ্টা ও কর্মের অনুগামী নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলারই নিয়ামত। তবে এ নিয়ামত লাভের জন্যে চেষ্টা ও কর্ম পূর্বশর্ত।

অতএব বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে জ্ঞানবুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সতর্কতা দান করেছেন, এসব শক্তির জন্য তার গর্ব করা উচিত নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই সুমতি ও হিদায়েত প্রার্থনা করা দরকার। সাধক রূমী চমৎকার বলেছেন ঃ

فهم وخاطر تيز كردن نيست راه
جز شكسته مى نگيرد فضل شاه

মোট কথা, তাঁরা উভয়েই স্বীয় দলকে উপদেশ দিলেন যে, আমালেকাদের বাহ্যিক শৌর্যবীর্য দেখে ভীত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বায়তুল মুকাদ্দাসের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তারাই জয়ী হবে। ফটক পর্যন্ত পৌঁছার পর তারা জয়লাভ করবে---তাদের এ ধারণার কারণ সম্ভবত এই যে, তাঁরা আমালেকা সম্প্রদায়কে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এরা দেহের দিক দিয়ে বিরাটকায় ও শক্তিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও মনের দিক দিয়ে অপরিপক্ক। আক্রমণের সংবাদ শুনে টিকে থাকতে পারবে না। এছাড়া মূসা (আ)-র মুখে আল্লাহ্-প্রদত্ত বিজয়ের সুসংবাদ তাঁরা শুনেছিলেন। এ সুসংবাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের ফলেও তাঁদের মনে উপরোক্ত ধারণা জন্মলাভ করতে পারে।

কিন্তু বনী ইসরাইল যেখানে পয়গম্বরের কথার প্রতিই কর্ণপাত করল না, সেখানে তাদের উপদেশের আর মূল্য কি? তারা পূর্বের জওয়াবই আরও বিশ্রী ভঙ্গীতে পুনরাবৃত্তি করল ঃ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ অর্থাৎ আপনি ও আপনার আল্লাহ্ উভয়ে গিয়েই যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব। বনী ইসরাইল বিদ্রূপের ভঙ্গীতে একথা বললে তা পরিষ্কার কুফর হতো এবং অতঃপর তাদের সাথে মূসা (আ)-র অবস্থান করা, তীহ্ প্রান্তরে দোয়া করা ইত্যাদি সম্ভবপর হতো না, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এ কারণে তফসীরবিদরা উপরোক্ত বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন---আপনি যান এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। আপনার আল্লাহ্ই আপনার সাহায্য করবেন, আমরা সাহায্য করতে অক্ষম। এ অর্থের দিক দিয়ে বনী ইসরাইলের জওয়াব কুফরের পরিধি অতিক্রম করে যায়---যদিও কথাটি অত্যন্ত বিশ্রী ও পীড়াদায়ক। এ কারণেই তাদের এ বাক্যটি প্রবাদ বাক্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বদর যুদ্ধে নিরস্ত্র ও ক্ষুধার্ত মুসলমানদের মুকাবিলায় এক হাজার সশস্ত্র জওয়ানের বাহিনী প্রস্তুত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) এ দৃশ্য দেখে আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করতে লাগলেন। এতে সাহাবী হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম! আমরা কস্মিন কালেও ঐ কথা বলব না, যা মূসা (আ)-কে তাঁর স্বজাতি বলেছিল : فاذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করব। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) একথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং সাহাবীদের মধ্যে জোশ ও উদ্দীপনার ঢেউ খেলতে লাগল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) প্রায়ই বলতেন ঃ মেকদাদ ইবনে আসওয়াদের এ কীর্তির জন্য আমি ঈর্ষান্বিত। আফসোস! এ সৌভাগ্য যদি আমি লাভ করতে পারতাম!

সারকথা এই যে, এহেন নাজুক মুহূর্তে বনী ইসরাইল মূসা (আ)-কে মূর্খজনোচিত উত্তর দিয়ে সব প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করল।

জাতির চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং মূসা (আ)-র অপরিসীম দৃঢ়তা ঃ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي বনী ইসরাইলের পূর্ববর্তী অবস্থা ও ঘটনাবলী এবং তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা ও মূসা (আ)-র আচার-আচরণ পর্যালোচনা করার পর যদি বনী ইসরাইলের উপরোক্ত বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়, তবে বাস্তবিকই বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। যে বনী ইসরাইল বহু শতাব্দী ধরে ফিরাউনের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ থেকে নানাবিধ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও নির্যাতন ভোগ করেছিল, হযরত মূসা (আ)-র শিক্ষার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের চোখের সামনে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শক্তি সামর্থ্যের কতই না হৃদয়গ্রাহী ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছিল। ফিরাউন ও ফিরাউনের পারিষদবর্গ নিজেদের আহূত দরবারে মূসা ও হারূন (আ)-এর হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছিল। যে যাদুকরদের উপর তাদের ভরসা ছিল, তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর গুণ গাইতে থাকে। এরপর খোদায়ীর দাবীদার ফিরাউন ও সুরম্য শাহী প্রাসাদে বসবাসকারী পারিষদবর্গ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার অপরাজেয় শক্তি কিভাবে সমুদয় রাজপ্রাসাদ ও আসবাবপত্রকে মুহূর্তের মধ্যে খালি করিয়ে নিয়েছিল! কিভাবে বনী ইসরাইলের দৃষ্টির সম্মুখে ফিরাউনকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছিল! কিভাবে অলৌকিক পন্থায় বনী ইসরাইলকে সমুদ্রের পরপারে পৌঁছে দিয়েছিল এবং কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউনের গোটা সাম্রাজ্য এবং তার অজস্র ও অগণিত অর্থ-সম্পদ কোনরূপ যুদ্ধ ও রক্তপাত ব্যতিরেকেই বনী ইসরাইলকে দান করেছিলেন! অথচ এসব অর্থ-সম্পদের জন্যই ফিরাউন একদিন সগর্বে বলত ঃ

الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی—মিসর সাম্রাজ্য আমার নয় কি এবং এসব নদনদী আমারই তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় না কি?

উপরোক্ত ঘটনাবলীতে আল্লাহ্ তা'আলার অজেয় শক্তি-সামর্থ্য বনী ইসরাইলের চোখের সামনে প্রকাশ পায়। মূসা (আ) তাদেরকে প্রথমে অমনোযোগিতা ও অজ্ঞানতা থেকে অতঃপর ফিরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে কতই না হৃদয়বিদারক কষ্ট সহ্য করেছেন! এ সবের পর যখন তাদেরকেই আল্লাহ্র সাহায্য ও অনুগ্রহের ওয়াদা সহ সিরিয়ায় জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তারাই চরম হীনমন্যতার পরিচয় দিয়ে বলতে থাকে ঃ اذ هب انت و ربک فقا تلا انا ههنا قا عدون o বিশ্বের কোন শ্রেষ্ঠতম সংস্কারক বুকের উপর হাত রেখে বলুক, এসব অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজির পর জাতির এ ধরনের আচরণ দেখে তার ধৈর্যের বাঁধ অটুট থাকবে কি? কিন্তু এখানে রয়েছেন আল্লাহ্র স্থির-প্রতিজ্ঞ পয়গম্বর যিনি পাহাড় হয়ে আপন সাধনায় মগ্ন।

তিনি জাতির উপর্যুপরি অঙ্গীকার ভঙ্গে বিরক্ত হয়ে স্বীয় পালনকর্তার দরবারে এত-টুকুই বললেন ঃ اِنِّیْ لَا اَمْلِکُ اِلَّا نَفْسِیْ وَاَخِیْ অর্থাৎ নিজের ও নিজের ভ্রাতা ছাড়া কারও উপর আমার ক্ষমতা নেই। এমতাবস্থায় আমালেকা জাতির বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ জয় করা যায়! এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে কমপক্ষে দু'জন সর্দার ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকান্না মূসা (আ)-র প্রতি আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরা জাতিকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনার ব্যাপারে মূসা (আ)-র সাথে পূর্ণ সহযোগিতাও করেছিলেন। এক্ষণে মূসা (আ) তাদের কথা উল্লেখ না করে শুধু নিজের ও হারূন (আ)-এর কথা উল্লেখ করলেন। এর কারণ ছিল বনী ইসরাইলেরই অবাধ্যতা। শুধু হারূন (আ) পয়গম্বর বিধায় নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁর সত্যপন্থী হওয়া ছিল নিশ্চিত। কিন্তু উপরোক্ত সর্দারদ্বয় নিষ্পাপ ছিলেন না। তাই চরম দুঃখ ও ক্ষোভের মুহূর্তে তিনি নিশ্চিত সত্যপন্থীর কথা বলেছেন।

হযরত মূসা (আ) দোয়া করলেন ঃ فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِیْنَ অর্থাৎ আমরা উভয় এবং আমাদের জাতির মধ্যে আপনিই ফয়সালা করে দিন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর তফসীর অনুযায়ী এ দোয়ার সারমর্ম এই যে, তারা যে শাস্তির যোগ্য, তাদেরকে তাই দিন এবং আমাদের জন্য যা উপযুক্ত তা আমাদেরকে দান করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা এ দোয়া কবুল করে বললেন ঃ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَیْهِمْ

اَرْبَعِیْنَ سَنَةً o یَتِیْهُوْنَ فِی الْاَرْضِ—অর্থাৎ সিরিয়ার পবিত্র ভূমি তাদের

জন্য চল্লিশ বছর পর্যন্ত হারাম ও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। এখন তারা সেখানে যেতে চাইলেও যেতে পারবে না। শুধু তাই নয়, তারা স্বদেশ মিসরে ফিরে যেতে চাইলেও যেতে পারবে না, বরং এ প্রান্তরেই অন্তরীণ হয়ে থাকবে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তির জন্য পুলিশ, হাতকড়া, জেলখানার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও লৌহকপাটের প্রয়োজন নেই। তিনি কাউকে অন্তরীণ করতে চাইলে উন্মুক্ত প্রান্তরেও করতে পারেন। কারণ, সমগ্র সৃষ্টজগতই তাঁর অধীন। তিনি যখন কাউকে বন্দী করার জন্য সৃষ্টজগতের প্রতি নির্দেশ জারি করেন, তখন সমগ্র আলোবাতাস, ময়দান, ভূ-পৃষ্ঠ ও বাসস্থান তার জেলদারোগা হয়ে যায় ঃ

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند
با من و تو مردہ با حق زندہ اند

সেমতে বনী ইসরাইল মিসর ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি ছোট্ট প্রান্তরে অন্তরীণ হয়ে পড়ে। হযরত মুকাতিলের বর্ণনা অনুযায়ী এ প্রান্তরের পরিধি দৈর্ঘ্যে ৯০ মাইল, প্রস্থে ২৭ মাইল। অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর আয়তন ৩০×১৮ মাইল। হযরত মুকাতিল বলেন---তখন বনী ইসরাইলের জনসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ। আল্লাহ্ তা'আলা এত জনবহুল জাতিকে এ ছোট্ট প্রান্তরে বন্দী করে দিলেন। কোনরূপে এ প্রান্তর থেকে বের হয়ে মিসরে ফিরে যেতে অথবা সামনে অগ্রসর হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছতে তাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। দীর্ঘ চল্লিশ বছর তারা নিষ্ফল প্রচেষ্টায় অতিবাহিত করে দেয়। তারা প্রত্যহ সকালে রওয়ানা হতো। পথ চলতে চলতে যখন বিকেল হয়ে যেত, তখন দেখতে পেত সকালে যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিল, সারাদিন ঘুরে সেখানেই পৌঁছে গেছে।

তফসীরবিদ আলিমগণ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতিকে সাজা দিলে তা তাদের কু-কর্মের সাথে সম্পর্ক রেখেই দেন। এ অবাধ্য জাতি বলেছিল ঃ إِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُونَ — আমরা এখানেই বসে থাকব। আল্লাহ্ তা'আলা সাজা হিসেবে তাদেরকে ৪০ বছর সেখানে বসিয়ে রাখলেন। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, বনী ইসরাইলের উপস্থিত বংশধর, যারা অবাধ্যতায় অংশ নিয়েছিল, ৪০ বছরে তারা সবাই একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। পরবর্তী বংশধরের মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিল, তারা ৪০ বছর পূর্তির পর মুক্ত হয়ে বায়তুল-মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেছিল। অন্য রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, উপস্থিত বংশধরের মধ্যেও কিছু লোক ৪০ বছর পর অবশিষ্ট ছিল। মোট কথা, আল্লাহ্র এক ওয়াদা ছিল এই كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ (আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সিরিয়া দেশ লিখে দিয়েছেন)। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। বনী ইসরাইলের উপস্থিত

বংশধরদের নাফরমানীর কারণে محرمة عليهم اربعين سنة — চল্লিশ বছর পর্যন্ত পবিত্র ভূমির দখল লাভ করা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়। অবশেষে তাদের বংশে যারা নতুন জন্মগ্রহণ করে তাদের হাতে এদেশ বিজিত হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করে।

তীহ্ প্রান্তরে হযরত মূসা এবং হারূন (আ)-ও স্বজাতির সাথে ছিলেন। কিন্তু জাতির জন্য এটি ছিল কয়েদখানা এবং তাঁদের জন্য আল্লাহ্র নিয়ামতের বিকাশ কেন্দ্র।

এ কারণেই চল্লিশ বছরের সাজার মেয়াদেও আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর বরকতে বনী ইসরাইলকে নানাবিধ নিয়ামতে ভূষিত করেন। উন্মুক্ত প্রান্তরে সূর্যের খরতাপে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে মূসা (আ)-র দোয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর মেঘমালার ছত্রছায়া প্রদান করেন। তারা যে দিকে যেত, মেঘমালা তাদের সাথে সাথে ছায়াদান করে যেতে থাকত। পানির অভাবে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে এক খণ্ড পাথর দান করলেন। পাথরটি সর্বত্র তাদের সাথে সাথে থাকত। পানির প্রয়োজন হলেই মূসা (আ) স্বীয় লাঠির দ্বারা পাথরের গায়ে আঘাত করতেন। অমনি তা থেকে বারটি ঝরনা প্রবাহিত হয়ে যেত। ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের জন্য আসমানী খাদ্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করা হত। রাত্রির অন্ধকার দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা একটি আলোর মিনার স্থাপন করে দিলেন। এর উজ্জ্বল রৌশনীতে তারা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করত।

মোট কথা, তীহ্ প্রান্তরে শুধু সাজাপ্রাপ্তরাই ছিল না। বরং আল্লাহ্ তা'আলার দু'জন প্রিয় পয়গম্বর এবং প্রিয় বান্দা ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকান্নাও ছিলেন। তাঁদের কল্যাণে বন্দীদশাতেও বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা 'রাহীমুররুহামা' সর্বাধিক দয়াশীল। বনী ইসরাইলের ব্যক্তিবর্গও সম্ভবত এসব অবস্থা দেখে তওবা করে থাকবে, যার প্রতিদানে তারা এসব নিয়ামত লাভ করেছে।

বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ চল্লিশ বছরের মেয়াদে সর্বপ্রথম হারূন (আ)-এর ওফাত হয়। এর এক বছর অথবা ছ মাস পর হযরত মূসা (আ)-র ওফাত হয়ে যায়। তাঁদের পর বনী ইসরাইলের হিদায়েতের জন্য ইউশা ইবনে নূন পয়গম্বররূপে আদিষ্ট হন। চল্লিশ বছর পূর্তির পর বনী ইসরাইলের অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁরই নেতৃত্বে বায়তুল-মুকাদ্দাসের জিহাদে রওয়ানা হয়। আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা অনুযায়ী তাঁদের হাতে সিরিয়া বিজিত হয় এবং অপরিমিত ধন-দৌলত হস্তগত হয়।

উপসংহারে বলা হয়েছে ঃ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ অর্থাৎ অবাধ্য জাতির জন্য আপনি বিষণ্ন হবেন না। এর কারণ এই যে, পয়গম্বররা স্বভাবগত-ভাবে উম্মতের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারেন না। উম্মত সাজাপ্রাপ্ত হলে তাতে তাঁরাও

দুঃখিত ও প্রভাবিত হন। তাই মূসা (আ)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তাদের শাস্তির কারণে আপনি মনক্ষুণ্ণ হবেন না।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ
اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ۭ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ۭ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ
اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٧﴾ لَىِٕنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا
بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾
اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِيْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ
وَذٰلِكَ جَزٰۗؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ
فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ
كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ۭ قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ
هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ﴿٣١﴾ مِنْ
اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰي بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا
بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۭ
وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۭ وَلَقَدْ جَاۗءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنٰتِ ۡ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٣٢﴾

(২৭) আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শোনান। যখন তারা উভয়েই কিছু উৎসর্গ নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয়নি। সে বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। সে বলল ঃ আল্লাহ্ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন। যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর, তবে আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করি। আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও। অতঃপর তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই অত্যাচারীদের শাস্তি। অতঃপর তার অন্তর

তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। অনন্তর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ্ এক কাক প্রেরণ করলেন। সে মাটি খনন করছিল—যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে! সে বলল ঃ আফসোস, আমি কি এ কাকের সমতুল্যও হতে পারলাম না যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ আবৃত করি! অতঃপর সে অনুতাপ করতে লাগল। এ কারণেই আমি বনী ইসরাইলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুত এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম,) আপনি আহ্লে-কিতাবকে (হযরত) আদম (আ)-এর পুত্রদ্বয়ের (অর্থাৎ হাবিল ও কাবিলের) সংবাদ যথাযথভাবে পাঠ করে শুনিয়ে দিন, (যাতে তাদের সৎ লোকদের সাথে সম্বন্ধশীল হওয়ার দর্প চূর্ণ হয়ে যায় ঃ نحن ابناء الله— 'আমরা আল্লাহ্র পুত্র' উক্তি দ্বারা এ দর্প ফুটে উঠে। ঘটনাটি তখন ঘটেছিল), যখন তারা উভয়ে (আল্লাহ্র নামে) এক একটি কুরবানী নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের (অর্থাৎ হাবিলের কুরবানী) গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের (অর্থাৎ কাবিলের) কোরবানী গৃহীত হয়নি। (কেননা যে বিষয়ের মীমাংসার জন্য এ কুরবানী নিবেদন করা হয়েছিল, তাতে হাবিল ছিল ন্যায় পথে। তাই তার কুরবানীটিই গৃহীত হয়। অপরপক্ষে কাবিল ন্যায় পথে ছিল না। তাই তার কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়। এরূপ না হলে কোন মীমাংসাই হতো না। এবং সত্য ধামাচাপা পড়ে যেত। যখন) সে (অর্থাৎ কাবিল এতেও হেরে গেল. তখন ক্রোধান্বিত হয়ে) বলতে লাগল ঃ আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। অপরজন (অর্থাৎ হাবিল) উত্তর দিল ঃ (তোমার পরাজয় তো তোমার অন্যায় পথে থাকার কারণেই। এতে আমার কি দোষ? কেননা,) আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মভীরুদের আমলই গ্রহণ করেন। (আমি ধর্মভীরুতা অবলম্বন করে আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে চলেছি। তিনি আমার উৎসর্গ গ্রহণ করেছেন। তুমি ধর্মভীরুতা পরিহার করেছ এবং আল্লাহ্র নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। তিনি তোমার উৎসর্গ কবুল করেন নি। তুমি নিজেই বিচার কর—এতে দোষ তোমার, না আমার? এরপরও যদি তুমি তাই চাও তবে তুমি জান। আমার দৃঢ় সংকল্প এই যে,) যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হাত বাড়াও তবুও আমি কিছুতেই তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হাত বাড়াব না। কেননা, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করি (অর্থাৎ তোমাকে হত্যা করার বাহ্যত একটি বৈধ কারণ মৌজুদ আছে। তা এই যে, তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও। কিন্তু আমি এ বৈধতার ব্যাপারে আজ পর্যন্ত আল্লাহ্র কোন নির্দেশ দেখিনি। তাই এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই। এ কারণে তোমাকে হত্যা করা সাবধানতার খেলাফ মনে করি। এ সন্দেহের ওপর ভিত্তি করেই আমি আল্লাহ্কে ভয়

করি। কিন্তু তোমার অবস্থা অন্যরূপ। যদিও আমাকে হত্যা করার কোন বৈধ কারণ নেই ; বরং বারণ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও তুমি আমাকে হত্যা করার দুঃসাহস করছ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করছ না) আমি ইচ্ছা করি, যেন (আমার দ্বারা কোন পাপ কাজ না হয়---তুমি আমার প্রতি যত অন্যায়ই কর না কেন। যাতে) আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথাতেই চাপিয়ে নাও, অতঃপর তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই অত্যাচারীদের শাস্তি। (কাবিল তো পূর্বেই হত্যার সংকল্প করে ফেলেছিল। এখন যখন শুনল যে, প্রতিরক্ষারও চেষ্টা করবে না, তখনই দয়া বিগলিত হওয়াই উচিত ছিল ; কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে আরও) তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় প্ররোচিত করল। অতঃপর সে তাকে হত্যাই করে ফেলল। ফলে সে (হতভাগা) ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (জাগতিক ক্ষতি এই যে, স্বীয় বাহুবল ও প্রাণপ্রতিম ভ্রাতা হারাল এবং পারলৌকিক ক্ষতি এই যে, হত্যার পাপের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। হত্যার পর মৃতদেহ কি করা হবে এবং এ রহস্য কিভাবে গোপন থাকবে---সে বিষয়ে কাবিল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। যখন কিছুই বুঝতে পারল না, তখন) আল্লাহ্ তা'আলা (অবশেষে) একটি কাক (সেখানে) পাঠিয়ে দিলেন। সে (চঞ্চু এবং থাবা দ্বারা) মাটি খনন করছিল (এবং খনন করে অপর একটি মৃত কাককে গর্তে ফেলে দিয়ে তার উপর মাটি নিক্ষেপ করছিল) যাতে (কাক) তাকে (অর্থাৎ কাবিলকে) শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার (হাবিলের) মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে ; (কাবিল এ ঘটনা দেখে মনে মনে খুবই অনুতপ্ত হল যে, একটি কাকের সমান বুদ্ধিও আমার মধ্যে নেই। সে নিরতিশয় অনুতপ্ত হয়ে) বলতে লাগল ঃ আফসোস, আমি কি এতই অক্ষম যে, কাকের তুল্যও হতে পারিনি এবং স্বীয় ভ্রাতার মৃতদেহ গোপন করতে পারিনি! অতঃপর সে (এ দুরবস্থার জন্য) খুবই লজ্জিত হল। এ (ঘটনার) কারণেই (যদ্দ্বারা অন্যায় হত্যার অনিষ্ট বোঝা যায়) আমি (শরীয়তের সব আদিষ্টদের প্রতি সাধারণভাবে এবং) বনী ইসরাইলের প্রতি (বিশেষভাবে এ নির্দেশ) লিখে দিয়েছি (অর্থাৎ বিধিবদ্ধ করে দিয়েছি) যে, (অন্যায় হত্যা এতবড় পাপ যে,) যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির) বিনিময় ছাড়া অথবা পৃথিবীতে কোন (অনিষ্টও) গোলযোগ ছাড়া (অনর্থক) কাউকে হত্যা করবে, (কোন কোন দিক দিয়ে তা এতবড় গোনাহ হবে যে,) সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। (কোন কোন দিক এই যে, গোনাহ করার দুঃসাহস করে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, জগতে প্রতিহত্যার যোগ্য হয়েছে এবং আখিরাতে দোযখের উপযুক্ত হয়েছে। এসব বিষয় একজনকে হত্যা করলে যেমন, এক হাজার জনকে হত্যা করলেও তেমনি, যদিও তীব্রতা ও তীব্রতরতায় পার্থক্য রয়েছে। আয়াতে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করার কারণ এই যে, অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা নাজায়েয নয়। এমনিভাবে হত্যা বৈধ হওয়ার অন্যান্য কারণও এর অন্তর্ভুক্ত যেমন ডাকাতি। পরবর্তী আয়াতে তা বর্ণিত হবে এবং হরবী ব্যক্তির কুফর, যা জিহাদের বিধি-বিধানে বর্ণিত হয়েছে---এসব কারণেও হত্যা করা জায়েয ; বরং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিব।) এবং (একথাও লিখে দিয়েছি যে, অন্যায়ভাবে হত্যা করা যেমন বিরাট পাপ, তেমনি কাউকে অন্যায় হত্যা থেকে বাঁচানোর সওয়াবও তেমনি বিরাট)। যে ব্যক্তি কারও জীবন রক্ষা করে, (সে এমন সওয়াব পাবে), সে যেন

সব মানুষের জীবন রক্ষা করল। (অন্যায় হত্যা বলার কারণ এই যে, শরীয়তের আইনে যাকে হত্যা করা জরুরী, তার সাহায্য করা অথবা সুপারিশ করা হারাম। জীবন রক্ষা করার এ বিধান লিপিবদ্ধ করার কারণেও হত্যাজনিত পাপের তীব্রতা প্রকট হয়ে পড়েছে। কারণ, জীবন রক্ষা যখন এমন প্রশংসনীয়, তখন জীবন নাশ করা অবশ্যই নিন্দনীয় না হয়ে পারে না। অতএব, عطف দ্বারা একে من اجل ذالك এর সাথে সম্বন্ধ-যুক্ত করা শুদ্ধ হয়েছে এবং বনী ইসরাইলকে এ বিষয়বস্তু লিখে দেওয়ার পর) আমার অনেক পয়গম্বরও (নবুয়তের) প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে তাদের কাছে এসেছেন (এবং প্রায় প্রায়ই এ বিষয়বস্তুর প্রতি জোর দিয়েছেন)। বস্তুত এরপরও (অর্থাৎ জোর দেওয়ার পরেও) তাদের অনেকেই পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করতে থাকে (তাদের উপর এসবের কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি, এমন কি কেউ কেউ স্বয়ং পয়গম্বরদের হত্যা করেছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হাবিল ও কাবিলের কাহিনী ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন---আপনি আহলে-কিতাবদেরকে অথবা সমগ্র উম্মতকে আদম আলায়হিস সালামের পুত্রদ্বয়ের সত্য কাহিনী বর্ণনা করে শুনিয়ে দিন।

কোরআন মজীদে অভিনিবেশকারী মাত্রই জানে যে, কোরআন পাক কোন কিসসা-কাহিনী অথবা ইতিহাস গ্রন্থ নয় যে, তাতে কোন ঘটনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করা হবে। এতদসত্ত্বেও অতীত ঘটনাবলী এবং বিগত জাতিসমূহের ইতিবৃত্তের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে। এগুলোই ইতিহাসের আসল প্রাণ। তন্মধ্যে অনেক অবস্থা ও ঘটনা এমনও রয়েছে, যেগুলোর ওপর শরীয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান ভিত্তিশীল। এসব উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন পাকের সামগ্রিক রীতি এই যে, স্থানে স্থানে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে এবং অধিকাংশ স্থানে পূর্ণ ঘটনা এক জায়গায় বর্ণনা করে না ; বরং ঘটনার যে অংশের সাথে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সম্পর্ক থাকে সে অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়।

হযরত আদম আলায়হিস সালামের পুত্রদ্বয়ের কাহিনীটিও এই বিজ্ঞরীতির ভিত্তিতে বর্ণনা করা হচ্ছে। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অনেক শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে শরীয়তের অনেক বিধি-বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এখন প্রথমে আয়াতের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা এবং তৎপ্রসঙ্গে আসল কাহিনী শুনুন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বর্ণনা করা হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে বনী ইসরাইলের প্রতি জিহাদের নির্দেশ এবং তাতে তাদের কাপুরুষতা ও ভীরুতা বর্ণনা করা হয়েছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য কাহিনীতে অন্যায় হত্যার অনিষ্ট ধ্বংসকারিতা বর্ণনা করে জাতিকে মিতাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সত্যের সমর্থনে এবং মিতাচার থেকে পেছনে হটা যেমন ভুল, তেমনি অন্যায় হত্যাকাণ্ডে এগিয়ে যাওয়া ইহকাল ও পরকালকে বরবাদ করার শামিল।

প্রথম আয়াতে اِبْنَىْ اٰدَمَ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। সাধারণত প্রত্যেক মানুষই আদমী এবং আদম সন্তান। সেমতে প্রত্যেককেই ابنى اٰدم বা আদম সন্তান বলা যায়। কিন্তু সাধারণ তফসীরবিদদের মতে এখানে ابنى اٰدم বলে হযরত আদমের ঔরসজাত পুত্রদ্বয় হাবিল ও কাবিলকে বোঝানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সততা অপরিহার্য ঃ তাদের কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ তাদেরকে আদমের পুত্রদ্বয়ের কাহিনী বিশুদ্ধ ও বাস্তব ঘটনা অনুযায়ী শুনিয়ে দিন। এতে بالحق শব্দ দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনায় খুবই সাবধানতা প্রয়োজন এবং এতে কোনরূপ মিথ্যা, জালিয়াতি ও প্রতারণার মিশ্রণ থাকা এবং প্রকৃত ঘটনা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হওয়া উচিত নয়।---(ইবনে কাসীর)

কোরআন পাক শুধু এখানেই নয়, বরং অন্যান্য জায়গায়ও এ মূলনীতি অনুসরণ-অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ দ্বিতীয় জায়গায় বলা হয়েছে ঃ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ তৃতীয় জায়গায় বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ এসব জায়গায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাথে حق শব্দ ব্যবহার করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, ঘটনাবলী বর্ণনায় সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক। জগতে রেওয়ায়েত ও বর্ণনার ভিত্তিতে যেসব অনিষ্ট দেখা দেয়, সাধারণত সেগুলোর মূল কারণ ঘটনাবলী বর্ণনায় অসাবধানতা। সামান্য শব্দ ও ভঙ্গির পরিবর্তনে ঘটনার স্বরূপ বিকৃত হয়ে যায়। এ অসাবধানতার কারণেই পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধর্ম ও শরীয়ত বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলী কতিপয় ভিত্তিহীন ও অচিন্তিত গল্প-গুজবের সমষ্টিতে পর্যবসিত হয়েছে। আয়াতে بالحق শব্দ যোগ করে এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের প্রতিই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া এ শব্দ দ্বারা কোরআন পাকের সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বাহ্যত নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও হাজারো বছর পূর্বেকার ঘটনাবলী যেভাবে

বিশুদ্ধ ও সত্য সত্য বর্ণনা করেছেন, তার কারণ আল্লাহ্‌র ওহী ও নবুয়ত ছাড়া আর কি হতে পারে ?

এ ভূমিকার পর কোরআন পাক পুত্রদ্বয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছে ঃ

إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ

আভিধানিক দিক দিয়ে যে বস্তু কারও নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে 'কুরবান' বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় কুরবান ঐ জন্তুকে বলে, যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়।

হযরত আদম আলায়হিস সালামের পুত্রদ্বয়ের কুরবানীর ঘটনাটি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী সনদসহ বর্ণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর একে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সর্বস্তরের আলিমদের সর্বসম্মত উক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন। ঘটনাটি এই ঃ যখন আদম ও হাওয়া (আ.) পৃথিবীতে আসেন এবং সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন প্রতি গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা—এরূপ যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করত। তখন ভ্রাতা-ভগিনী ছাড়া হযরত আদমের আর কোন সন্তান ছিল না। অথচ ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে আদম (আ)-এর শরীয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা-ভগিনী গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারিণী কন্যা সহোদরা ভগিনী গণ্য হবে না। তাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে কাবিলের সহজাত সহোদরা ভগিনীটি ছিল পরমাসুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত কন্যাটি ছিল কুশ্রী ও কদাকার। বিবাহের সময় হলে নিয়মানুযায়ী হাবিলের সহজাত কুশ্রী কন্যা কাবিলের ভাগে পড়ল। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবিলের শত্রু হয়ে গেল। সে জেদ ধরল যে, আমার সহজাত ভগিনীকেই আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। হযরত আদম (আ) তাঁর শরীয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের আব্দার প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ তোমরা উভয়েই আল্লাহ্‌র জন্য নিজ নিজ কুরবানী পেশ কর। যার কুরবানী পরিগৃহীত হবে, সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করবে। হযরত আদম আলায়হিস সালামের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যে সত্য পথে আছে, তার কুরবানীই গৃহীত হবে।

তৎকালে কুরবানী গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা অবতীর্ণ হয়ে কুরবানীকে ভস্মীভূত করে আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানী অগ্নি ভস্মীভূত করত না, তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হত।

হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করত। সে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। কাবিল কৃষিকাজ করত। সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানীর জন্য পেশ করল।

অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কুরবানীটিকে ভস্মীভূত করে দিল এবং কাবিলের কুরবানী যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃত-কার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না। এবং প্রকাশ্যে ভাইকে বলে দিল ঃ لَأَقْتُلَنَّكَ অর্থাৎ অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব।

হাবিল তখন ক্রোধের জওয়াবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করল। এতে কাবিলের প্রতি তার সহানুভূতি ও শুভেচ্ছাও ফুটে উঠেছিল। সে বলল ঃ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ম এই যে, তিনি আল্লাহ্ভীরু পরহিযগারের কর্মই গ্রহণ করেন। তুমি আল্লাহ্ভীতি অবলম্বন করলে তোমার কুরবানীও গৃহীত হত। তুমি তা করনি, তাই কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমার দোষ কি?

এ বাক্যে হিংসুটের হিংসার প্রতিকারও বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ হিংসাকারী যখন দেখে যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছে, যা সে প্রাপ্ত হয়নি, তখন একে নিজ কর্মদোষ ও গোনাহের ফলশ্রুতি মনে করে গোনাহ্ থেকে তওবা করা উচিত। অন্যের নিয়ামত অপনোদনের চেষ্টা করা উচিত নয়। তাতে উপকারের পরিবর্তে অপকারই হবে বেশী। কারণ, আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হওয়া আল্লাহ্ভীতির ওপর নির্ভরশীল।

সৎকর্ম গৃহীত হওয়া আন্তরিকতা ও আল্লাহ্-ভীতির ওপর নির্ভরশীল ঃ এখানে হাবিল ও কাবিলের কথোপকথনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে যে, সৎকর্ম ও ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ্ভীতির ওপর নির্ভরশীল। যার মধ্যে আল্লাহ্ভীতি নেই, তার সৎকর্মও গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই পূর্ববর্তী আলিমরা বলেছেন ঃ আলোচ্য আয়াত ইবাদতকারী ও সৎকর্মীদের জন্য চাবুক স্বরূপ। এজন্যই হযরত আমের ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা) অন্তিম মুহূর্তে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ আপনি তো সারা জীবন সৎকর্ম ও ইবাদতে মশগুল ছিলেন। এখন কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন ঃ তোমরা একথা বলছ, আর আমার কানে আল্লাহ্ তা'আলার এ বাক্য প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ঃ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ আমার কোন ইবাদত গৃহীত হবে কি না তা আমার জানা নেই।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ যদি আমি নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার কোন সৎকর্ম গ্রহণ করেছেন, তবে এটা হবে আমার জন্য একটি বিরাট নিয়ামত। এ নিয়ামতের বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবী স্বর্ণে পরিণতি হয়ে আমার অধিকারে এসে গেলেও আমি তাকে কিছুই মনে করব না।

হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন ঃ যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আমার একটি

নামায আল্লাহ্‌র কাছে কবুল হয়েছে, তবে আমার জন্য এটি হবে সমগ্র বিশ্ব ও তার অগণিত নিয়ামতের চাইতেও উত্তম।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) কোন এক ব্যক্তিকে পত্র মারফত নিম্নোক্ত উপদেশাবলী প্রেরণ করেন ঃ

আমি জোর দিয়ে বলছি যে, তুমি আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বন কর। এছাড়া কোন সৎকর্ম গৃহীত হয় না। আল্লাহ্‌ভীরু ছাড়া কারও প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয় না এবং এটি ছাড়া কোন কিছুর সওয়াবও পাওয়া যায় না। এ বিষয়ের উপদেশদাতা অনেক ; কিন্তু একে কার্যে পরিণত করে—এরূপ লোকের সংখ্যা নগণ্য।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌-ভীতির সাথে ছোট সৎকর্মও ছোট নয়। যে সৎকর্ম গৃহীত হয়ে যায়, তাকে কেমন করে ছোট বলা যায়।

অপরাধ ও শাস্তির কতিপয় কোরআনী বিধি ঃ

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

(৩৩) যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (৩৪) কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে ; জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী, দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং (এ সংগ্রামের অর্থ এই যে,) দেশময় অনর্থ (অশান্তি) সৃষ্টি করে বেড়ায় [অর্থাৎ রাহাজানি-ডাকাতি করে, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা শরীয়তের আইনে অভয় দিয়েছেন এবং যে আইন রসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে ; অর্থাৎ মুসলমান ও যিম্মির বিরুদ্ধে। এ কারণেই একে আল্লাহ্‌ ও রসূলের সাথে সংগ্রাম করা বলা হয়েছে। কেননা, ডাকাত

আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন ভঙ্গ করে। যেহেতু রসূলের মাধ্যমে আইন প্রকাশ পেয়েছে, তাই রসূলের সম্পর্কও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মোট কথা, যারা ডাকাতি করে] তাদের শাস্তি হল এই যে, (এক অবস্থায়) তাদেরকে হত্যা করা হবে। (সে অবস্থা এই যে, ডাকাতরা শুধু কাউকে হত্যা করেছে—অর্থ-সম্পদ নেয়নি।) অথবা (অন্য অবস্থা হলে) শূলীবিদ্ধ করা হবে। (সে অবস্থা এই যে, ডাকাতরা অর্থ-সম্পদও নিয়েছে, হত্যাও করেছে) অথবা (তৃতীয় অবস্থা হলে) তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে (অর্থাৎ ডান হাত, বাম পা) কেটে দেওয়া হবে। (এ অবস্থা এই যে, শুধু অর্থ সম্পদ নিয়েছে—কাউকে হত্যা করেনি) অথবা (চতুর্থ অবস্থা হলে) দেশ থেকে (অর্থাৎ দেশে স্বাধীনভাবে বিচরণ করার অধিকার) থেকে বহিষ্কার (করে জেলে প্রেরণ করা) করা হবে। (এ অবস্থাটি এই যে, অর্থ-সম্পদ গ্রহণ অথবা হত্যা কিছুই করেনি; বরং ডাকাতির প্রস্তুতি নিতেই গ্রেফতার হয়ে গেছে)। এটি (অর্থাৎ উপরোক্ত শাস্তি তো) তাদের জন্য দুনিয়াতে কঠোর লাঞ্ছনা (এবং অপমান) এবং তাদের আখিরাতে (যে) শাস্তি হবে (তা পৃথক)। কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতার করার পূর্বে তওবা করে নেয়, (এমতাবস্থায়) জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা (স্বীয় পাওনা) ক্ষমা করে দেবেন (এবং তওবা করায় তাদের প্রতি) করুণা করবেন। (অর্থাৎ উল্লিখিত শাস্তি হদ্ এবং আল্লাহ্র পাওনা হিসেবে দেওয়া হবে—যা বান্দা ক্ষমা করলে ক্ষমা হবে না—কিসাস ও বান্দার পাওনা হিসেবে নয়—যা বান্দা ক্ষমা করলে ক্ষমা হয়ে যায়। সুতরাং গ্রেফতারীর পূর্বে তাদের তওবা প্রমাণিত হলে আল্লাহ্র পাওনা হদ্ থেকে অব্যাহতি পাবে। তবে বান্দার পাওনা বাকী থাকবে। অর্থ-সম্পদ নিয়ে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হত্যা করে থাকলে কিসাস নেওয়া হবে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ ও কিসাস মাফ করার অধিকার পাওনাদার ও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআনী আইনের অভিনব ও বৈপ্লবিক পদ্ধতি ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হত্যা-কাণ্ড এবং তার গুরুতর অপরাধের কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে হত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাতি ও চুরির শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। ডাকাতি ও চুরির শাস্তির মাঝখানে আল্লাহ্-ভীতি ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কোরআন পাকের এ পদ্ধতি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি করে। মানব রচিত দণ্ডবিধির মত কোরআন পাক শুধু অপরাধ ও শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে আল্লাহ্-ভীতি ও পরকাল কল্পনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও গোনাহ্ থেকে পবিত্র করে দেয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, জনমনে আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতের ভয় সৃষ্টি করা ছাড়া জগতের কোন আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কোরআন পাকের এই বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতিই জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে এবং এমন লোকদের একটি সমাজ গঠন করেছে, যারা পবিত্রতায় ফেরেশতাদের চাইতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

শরীয়তের শাস্তি তিন প্রকার ঃ চুরি ও ডাকাতির শাস্তি এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতের তফসীর বর্ণনা করার পূর্বে এসব শাস্তি সম্পর্কে শরীয়তের পরিভাষায় কিছুটা ব্যাখ্যা আবশ্যক। কেননা, এসব পরিভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক শিক্ষিত লোকের মনেও নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দেয়। জগতের সাধারণ আইনে অপরাধ সম্পর্কিত সব শাস্তিকেই 'দণ্ডবিধি' নামে অভিহিত করা হয়। 'ভারতীয় দণ্ডবিধি', 'পাকিস্তান দণ্ডবিধি' ইত্যাদি নামে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সর্বপ্রকার অপরাধ ও সব ধরনের শাস্তিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে এরূপ নয়। ইসলামী শরীয়তে অপরাধের শাস্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ হুদূদ, কিসাস ও তা'যীরাত অর্থাৎ দণ্ডবিধি। এগুলোর সংজ্ঞা ও অর্থ জানার পূর্বে প্রথমত একথা জেনে নেওয়া জরুরী যে, এসব অপরাধের দরুন অন্য মানুষের কষ্ট অথবা ক্ষতি হয়, তাতে সৃষ্ট জীবের প্রতিও অন্যায় করা হয় এবং স্রষ্টারও নাফরমানী করা হয়। তাই এ জাতীয় অপরাধে 'হক্কুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র হক) এবং 'হক্কুল আব্‌দ' (বান্দার হক)---দুইই বিদ্যমান থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের কাছেই অপরাধী বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু কোন কোন অপরাধে বান্দার হক এবং কোন কোন অপরাধে আল্লাহ্‌র হক প্রবল থাকে এবং এ প্রাবল্যের ওপর ভিত্তি করেই বিধি-বিধান রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত একথা জানা জরুরী যে, ইসলামী শরীয়ত বিশেষ বিশেষ অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি, বরং বিচারকের অভিমতের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্য যেরূপ ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করবেন ততটুকুই দেবেন। প্রত্যেক স্থান ও কালের ইসলামী সরকার যদি শরীয়তের রীতিনীতি বিবেচনা করে বিচারকদের ক্ষমতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করে, তবে তাও জায়েয। বর্তমান শতাব্দীতে তাই হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় সব ইসলামী দেশে এ ব্যবস্থাই প্রচলিত রয়েছে।

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, যেসব অপরাধের কোন শাস্তি কোরআন ও সুন্নাহ্‌ নির্ধারণ করেনি, বরং বিচারকদের অভিমতের ওপর ন্যস্ত করেছে, সেসব শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'তা'যীরাত' তথা 'দণ্ড' বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি কোরআন ও সুন্নাহ নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেগুলো দু'রকম ঃ এক. যেসব অপরাধে আল্লাহ্‌র হকের পরিমাণ প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে 'হদ' বলা হয়। আর 'হদ'-এরই বহুবচন 'হুদূদ'। দুই. যেসব অপরাধে বান্দার হককে শরীয়তের বিচারে প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে বলা হয় 'কিসাস'। কোরআন পাক হুদূদ ও কিসাস পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছে। আর দণ্ডনীয় অপরাধের বিবরণকে রসূলের বর্ণনা ও সমকালীন বিচারকদের অভিমতের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

সারকথা, কোরআন পাক যেসব অপরাধের শাস্তিকে আল্লাহ্‌র হক হিসেবে নির্ধারণ করে জারি করেছে, সেসব শাস্তিকে 'হুদূদ' বলা হয় এবং যেসব শাস্তিকে বান্দার হক হিসেবে জারি করেছে, সেগুলোকে 'কিসাস' বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ

করেনি, সে জাতীয় শাস্তিকে বলা হয় 'তা'যীর' তথা 'দণ্ড'। শাস্তির এ প্রকার তিনটির বিধান অনেক বিষয়েই বিভিন্ন। যারা নিজেদের পরিভাষার ভিত্তিতে প্রত্যেক অপরাধের শাস্তিকে দণ্ড বলে এবং শরীয়তের পরিভাষাগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা শরীয়তের বিধি-বিধানে অনেক বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়।

দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘুতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। এ ব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু হদূদের বেলায় কোন সরকার, শাসনকর্তা অথবা বিচারকই সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধিকারী নয়। স্থান ও কাল ভেদেও এতে কোন পার্থক্য হয় না এবং কোন শাসক ও বিচারক তা ক্ষমা করতে পারে না। শরীয়তে হদূদ মাত্র পাঁচটি ঃ ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ---এ চারটির শাস্তি কোরআনে বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চমটি মদ্য পানের হদ। এটি সাহাবায়ে-কিরামের ইজমা তথা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। এভাবে মোট পাঁচটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ও হদূদরূপে চিহ্নিত হয়েছে। এসব শাস্তি যেমন কোন শাসক ও বিচারক ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না। তবে খাঁটি তওবা দ্বারা আখিরাতের গোনাহ্ মাফ হয়ে সেখানকার হিসাব-কিতাব থেকে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। তন্মধ্যে শুধু ডাকাতির শাস্তির বেলায় একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তওবা করে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারাও তওবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে সে হদ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পরবর্তী তওবা ধর্তব্য নয়। অন্যান্য হদূদ তওবা দ্বারাও মাফ হয় না। এ তওবা গ্রেফতারীর পূর্বে হোক অথবা পরে। সব দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ শ্রবণ করা যায়; কিন্তু হদূদের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা শ্রবণ করা দুই-ই নাজায়েয। রসূলুল্লাহ্ (সা) এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হদূদের শাস্তি সাধারণত কঠোর। এগুলো প্রয়োগ করার আইনও নির্মম। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না এবং কেউ ক্ষমা করারও অধিকারী নয়। কিন্তু সাথে সাথে সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলীও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তাবলীর মধ্য থেকে যদি কোন একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ অপরাধ প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ প্রয়োগ করা যায় না। এ ব্যাপারে শরীয়তের স্বীকৃত আইন হচ্ছে ঃ الحدود تندرئ بالشبهات—অর্থাৎ হদূদ সামান্যতম সন্দেহের কারণেই অকেজো হয়ে পড়ে।

এ ক্ষেত্রে বুঝে নেওয়া উচিত যে, কোন সন্দেহ অথবা কোন শর্তের অনুপস্থিতির কারণে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছাড়পত্র পেয়ে যাবে, যার ফলে তার অপরাধ প্রবণতা আরও বেড়ে যাবে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে দণ্ডগত শাস্তি দেবেন। শরীয়তের দণ্ডগত শাস্তিসমূহ সাধারণত দৈহিক ও শারীরিক। এগুলো দৃষ্টান্তমূলক হওয়ার কারণে অপরাধ দমনে খুবই কার্যকর। ধরুন, ব্যভিচার প্রমাণে মাত্র তিন জন সাক্ষী পাওয়া গেল এবং তারা সবাই নির্ভরযোগ্য ও মিথ্যার সন্দেহ থেকে মুক্ত। কিন্তু আইনানুযায়ী চতুর্থ সাক্ষী না থাকার কারণে হদ জারি করা যাবে না। কিন্তু এর অর্থ

এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি অথবা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, বরং বিচারক তাকে অন্য কোন উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করবেন, যা বেত্রাঘাতের আকারে হবে।

তেমনিভাবে চুরি প্রমাণের জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহে কোন ত্রুটি অথবা সন্দেহ দেখা দেওয়ার কারণে চোরের হাত কেটে দেওয়া যাবে না বটে, কিন্তু এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণ মুক্তও হয়ে যাবে না ; বরং তাকে অবস্থানুযায়ী অন্য দণ্ড দেওয়া হবে।

কিসাসের শাস্তিও হুদূদের মত কোরআন পাকে নির্ধারিত। অর্থাৎ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ সংহার করা হবে এবং জখমের বিনিময়ে সমান জখম করা হবে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, হুদূদকে আল্লাহর হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা হবে না এবং হদ অব্যবহার্য হবে না। উদাহরণত যার অর্থ চুরি যায়, সে ক্ষমা করলেও চোরের নির্ধারিত শাস্তি অপ্রযোজ্য হবে না। কিন্তু কিসাস এর বিপরীত। কিসাসে বান্দার হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর ইখতিয়ারে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে কিসাস হিসেবে তাকে মৃত্যুদণ্ডও করাতে পারে। জখমের কিসাসও তদ্রূপ।

পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, হুদূদ ও কিসাস অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি পেয়ে যাবে, বরং বিচারক দণ্ডমূলক শাস্তি যতটুকু উপযুক্ত মনে করেন দিতে পারবেন। কাজেই নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলে হত্যাকারীদের সাহস বেড়ে যাবে কিংবা ব্যাপক হারে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে--এরূপ আশংকা করা ঠিক নয়। কেননা, হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করা ছিল নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য। সে তা ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর লোকদের প্রাণ রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার এ দায়িত্ব পালনের জন্য হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অন্য কোন শাস্তি দিয়ে এ বিপদাশংকা রোধ করতে পারে।

এ পর্যন্ত হুদূদ, কিসাস, তা'যীরাত প্রভৃতি পরিভাষার অর্থ ও তৎসংক্রান্ত জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হল। এবার এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও হুদূদের বিবরণ শুনুন। প্রথম আয়াতে যারা আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে সংগ্রাম ও মোকাবিলা করে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

এখানে প্রথমে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে সংগ্রাম এবং দেশে অনর্থ সৃষ্টি করার অর্থ কি এবং এরা কারা? يحاربون শব্দটি حرب মূল ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিনিয়ে নেওয়া। বাচন-পদ্ধতিতে এ শব্দটি سلم- অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তার বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব, حرب-এর অর্থ হচ্ছে অশান্তি বিস্তার করা। একথা জানা যে, বিক্ষিপ্ত চুরি, হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনায় জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় না, বরং কোন সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী দল ডাকাতি, হত্যা ও লুটতরাজে প্রবৃত্ত হলেই জননিরাপত্তা ব্যাহত হয়। এ কারণেই ফিকহ্‌বিদরা ঐ দল অথবা ব্যক্তিদের এ শাস্তির যোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন, যারা অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে ডাকাতি করে এবং শক্তির জোরে সরকারের

আইন ভঙ্গ করতে চায়। শব্দান্তরে তাদেরকে ডাকাত দল অথবা বিদ্রোহী দল বলা যায়। সাধারণ চোর, পকেটমার ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত নয়।---(তফসীরে মাযহারী)

এখানে প্রণিধানযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আলোচ্য আয়াতে محاربة অর্থাৎ সংগ্রাম করাকে আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে, অথচ ডাকাত অথবা বিদ্রোহীদের সংগ্রাম ও সংঘর্ষ হয় জনগণের সাথে। এর কারণ এই যে, কোন শক্তিশালী দল যখন শক্তির জোরে আল্লাহ্ ও রসূলের আইন ভঙ্গ করতে চায়, তখন বাহ্যত জনগণের সাথে সংঘর্ষ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই হয়ে থাকে। রাষ্ট্রে যখন আল্লাহ্ ও রসূলের আইন কার্যকরী থাকবে, তখন এ সংঘর্ষও আল্লাহ্ ও রসূলের বিপক্ষেই গণ্য হবে।

সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে বর্ণিত শাস্তি ঐসব ডাকাত ও বিদ্রোহীদের বেলায় প্রযোজ্য, যারা সংঘবদ্ধ শক্তির জোরে আক্রমণ চালিয়ে জননিরাপত্তা ব্যাহত করে এবং প্রকাশ্যে সরকারের আইন অমান্য করার চেষ্টা করে। এর অর্থ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। অর্থ লুণ্ঠন করা, শ্লীলতাহানি ইত্যাদি থেকে শুরু করে হত্যা ও রক্তপাত পর্যন্ত সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এ থেকেই محاربة ও مقاتلة শব্দদ্বয়ের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। مقاتلة শব্দটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অর্থে ব্যবহৃত হয়---তাতে কেউ নিহত হোক বা না হোক এবং অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন করা হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে محاربة শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্তি সহকারে অশান্তি ছড়ানো এবং নিরাপত্তা ব্যাহত করা।

এ অপরাধের শাস্তি কোরআন পাক স্বয়ং নির্ধারিত করে দিয়েছে এবং আল্লাহ্র হক অর্থাৎ গভর্নমেন্টবাদী অপরাধ হিসেবে প্রয়োগ করেছে। শরীয়তের পরিভাষায় একেই 'হদ' বলা হয়। এবার শুনুন ডাকাতি ও রাহাজানির শাস্তি। আয়াতে চারটি শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ -

অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। প্রথমোক্ত তিন শাস্তিতে باب تفعيل থেকে مبالغة এর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা ক্রিয়ার পৌনঃপুনিকতা ও তীব্রতা বোঝায়। ক্রিয়াপদে বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের হত্যা অথবা শূলীতে চড়ানো অথবা হস্তপদ কেটে দেওয়া সাধারণ শাস্তির মত নয় যে, যে লোক অপরাধী প্রমাণিত হবে, তাকেই শাস্তি দেওয়া হবে, বরং এ অপরাধে দলের মধ্য থেকে একজনের করলেও গোটা দলকে হত্যা অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা গোটা দলেরই হস্তপদ কেটে দেওয়া হবে।

এ ছাড়া এতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ শাস্তি কিসাস হিসেবে নয় যে, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী মাফ করে দিলেই মাফ হয়ে যাবে, বরং তা আল্লাহ্‌র হক হিসেবে প্রয়োগ করা হবে। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা মাফ করলেও তা মাফ হবে না। باب تفعيل থেকে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করার কারণে এ দু'টি ইঙ্গিতই বোঝা যাচ্ছে। —(তফসীরে-মাযহারী)

ডাকাতির এ চারটি শাস্তি, او (অথবা) শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দটি যেমন কয়েকটি বিষয়ের মধ্য থেকে কোন একটিকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা দান অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি কর্ম বন্টনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই সাহাবী ও তাবেয়ী ফিকহ্‌-বিদদের একটি দল প্রথমোক্ত অর্থ ধরে মত প্রকাশ করেছেন যে, শরীয়তের পক্ষ থেকে শাসক ও বিচারককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, ডাকাত দলের শক্তি এবং অপরাধের তীব্রতা ও লঘুতা দৃষ্টে তিনি শাস্তি চতুষ্টয় অথবা যে কোন একটি শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন।

সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রা), আতা (রা), দাউদ (র), হাসান বসরী (র), যাহ্‌হাক (র), নখয়ী (র), মুজাহিদ (র) এবং ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম মালেক (র)-এর মযহাবও তাই। ইমাম আবূ হানীফা (র), শাফেয়ী (র), আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এবং একদল সাহাবী ও তাবেয়ী او শব্দটিকে কর্ম বন্টনের অর্থে ধরে নিয়ে বলেছেন যে, আয়াতে রাহাজানির বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে। এক হাদীস থেকেও তাঁদের এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবূ বুরদা আসলামীর সাথে এক সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু সে সন্ধি ভঙ্গ করে এবং মুসলমান হওয়ার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে অগ্রসরমান একটি কাফেলা লুট করে। এ ঘটনার পর জিবরাঈল (আ) রাহাজানির শাস্তি সংক্রান্ত নির্দেশ নিয়ে অবতরণ করেন। নির্দেশনামায় বলা হয়, যে ব্যক্তি হত্যা ও লুণ্ঠন উভয় অপরাধ করে, তাকে শূলীতে চড়াতে হবে। যে শুধু হত্যা করে তাকে হত্যা করতে হবে। যে শুধু অর্থ লুট করে তার হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করতে হবে। ডাকাত দলের মধ্যে যে মুসলমান হয়ে যায়, তার অপরাধ ক্ষমা করতে হবে। পক্ষান্তরে যে হত্যা ও লুণ্ঠন কিছুই করেনি---শুধু ভীতি প্রদর্শন করে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে, তাকে দেশান্তরিত করতে হবে। যদি ডাকাতদল ইসলামী রাষ্ট্রের কোন মুসলিম অথবা অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে এবং অর্থ লুণ্ঠন না করে, তবে তাদের শাস্তি হবে ان يقتلوا—অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে তাদের কিছু সংখ্যক লোক হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকলেও তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে। আর যদি হত্যা ও অর্থ লুণ্ঠন উভয় অপরাধই সাব্যস্ত হয়, তবে তাদের শাস্তি হবে يصلبوا অর্থাৎ সবাইকে শূলীতে চড়ানো হবে। এর ধরন হবে এই যে, জীবিতাবস্থায় শূলীতে চড়িয়ে পরে বর্শা ইত্যাদি দ্বারা তার পেট চিরে দেওয়া হবে। যদি ডাকাত দল শুধু অর্থ লুট করে, তবে তাদের শাস্তি হবে ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف অর্থাৎ ডান হাত কব্জি থেকে এবং বাম পা গিঁট থেকে কেটে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রেও যদি কিছু লোক অর্থ লুণ্ঠনে প্রত্যক্ষভাবে

জড়িত থাকে তবুও সবাইকে শাস্তি দেওয়া হবে। কেননা, দলের অন্যদের সাহায্য ও সহযোগিতার ভরসায়ই তারা এ কাজ করে। তাই অপরাধে সবাই সমান অংশীদার। যদি ডাকাত দল হত্যা ও লুণ্ঠনের পূর্বেই গ্রেফতার হয়ে যায়, তবে তাদের সাজা হবে او ينفوا من الارض অর্থাৎ তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।

দেশ থেকে বহিষ্কার করার অর্থ একদল ফিকহ্‌বিদের মতে এই যে, তাদেরকে দারুল-ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়া হবে। কেউ কেউ বলেন ঃ যে জায়গায় ডাকাতির আশংকা ছিল, সেখান থেকে বের করে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর ফয়সালা এই যে, অপরাধীকে এখান থেকে বের করে অন্য শহরে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে যেহেতু সে সেখানকার অধিবাসীদেরকেও উত্ত্যক্ত করবে, তাই এ জাতীয় অপরাধীকে জেলখানায় আবদ্ধ রাখতে হবে। অবাধ চলাফেরা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে এটাই তার পক্ষে দেশ থেকে বহিষ্কার। ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও এ ফয়সালাই দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, আজকাল এ জাতীয় সশস্ত্র আক্রমণে শুধু লুটতরাজ, হত্যা ইত্যাদি হয় না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী ধর্ষণ, অপহরণ ইত্যাদি ঘটনাই ঘটে থাকে। কোরআন পাকের وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا বাক্যে এ জাতীয় সব অপরাধই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় সশস্ত্র আক্রমণকারীরা কোন্ শাস্তির যোগ্য ? উত্তর এই যে, এক্ষেত্রে বিচারক শাস্তি চতুষ্টয়ের মধ্য থেকে অবস্থানুযায়ী যে কোন একটি শাস্তি জারি করবেন। যদি ব্যভিচারের যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে ব্যভিচারের হদ জারি করবেন।

এমনিভাবে শুধু কিছু লোককে জখম করে থাকলে জখমের কিসাস জারি করা হবে। —(তফসীরে মাযহারী)

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

দুনিয়াতে প্রদত্ত এ শাস্তি হচ্ছে তাদের জাগতিক লাঞ্ছনা। আখিরাতের শাস্তি হবে আরও কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী। এতে বোঝা যায় যে, তওবা না করলে জাগতিক হদূদ, কিসাস ইত্যাদি দ্বারা পরকালের শাস্তি মাফ হবে না। হাঁ, সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি খাঁটি মনে তওবা করলে পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত ঃ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا---আয়াতে একটি ব্যতিক্রমের কথা বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, ডাকাত ও বিদ্রোহী দল যদি সরকারী লোকদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে শক্তি-সামর্থ্য বহাল থাকা অবস্থায় তওবা করে এবং ডাকাতি ও রাহাজানি থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, তবে তাদের ক্ষেত্রে হদ প্রযোজ্য হবে না।

এ ব্যতিক্রমটি হুদূদের সাধারণ আইন থেকে ভিন্নধর্মী। কেননা চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি অপরাধে আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর অপরাধী খাঁটি মনে তওবা করলেও হদ মাফ হয় না, যদিও আখিরাতের শাস্তি মাফ হয়ে যায়। কয়েক আয়াত পর চুরির শাস্তি প্রসঙ্গে এ বিষয়টির বিস্তারিত বর্ণনা আসবে।

এ ব্যতিক্রমের তাৎপর্য এই যে, একদিকে ডাকাতদের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। এদের একজনের অপরাধে গোটা দলকেই শাস্তি দেওয়া হয়। তাই অপরদিকে ব্যতিক্রমের মাধ্যমে ব্যাপারটিকে হালকা করে দেওয়া হয়েছে যে, তওবা করলে জাগতিক শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। এ ছাড়া এতে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও রয়েছে। তা এই যে, একটি শক্তিশালী দলকে বশে আনা সহজ কাজ নয়। তাই তাদের সামনে সত্যোপলব্ধির দরজা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, যাতে তারা তওবার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

এ ছাড়া আরও একটি উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুদণ্ড নিঃসন্দেহে একটি চূড়ান্ত শাস্তি। ইসলামী আইনের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, এ শাস্তির প্রয়োগ যেন যথাসম্ভব কম হয়। অথচ ডাকাতির ক্ষেত্রে একটি দলকে হত্যা করা জরুরী হয়ে পড়ে। তাই ডাকাতদের সামনে সংশোধনের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ সুযোগের কারণেই আলী আসাদী নামক জনৈক দুর্ধর্ষ ডাকাত ডাকাতি থেকে তওবা করতে সক্ষম হয়েছিল।

আলী আসাদী মদীনার অদূরে একটি সংঘবদ্ধ দল তৈরী করে পথিকদের অর্থ-সম্পদ লুট করত। একদিন কাফেলার মধ্য থেকে জনৈক কারীর মুখে এ আয়াত তার কানে পড়ল ঃ

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ

(হে আমার অনাচারী বান্দারা, তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।) সে কারীর কাছে পৌঁছে আয়াতটি পুনরায় পাঠ করতে অনুরোধ করল। পুনর্বার আয়াতটি শুনেই সে তরবারি কোষবদ্ধ করে রাহাজানি থেকে তওবা করল এবং মদীনার তৎকালীন শাসনকর্তা মারওয়ান ইবনে হাকামের দরবারে উপস্থিত হল। হযরত আবূ হোরায়রা (রা) তার হাত ধরে মারওয়ানের সম্মুখে উপস্থিত করলেন এবং উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে বললেন ঃ আপনি তাকে কোন শাস্তি দিতে পারবেন না।

সরকার তার তৎপরতায় অতিষ্ঠ ছিল। ফলে তার সুমতি দেখে সবাই সন্তুষ্ট হল।

হযরত আলী (রা)-র খিলাফতকালে হারেসা ইবনে বদর বিদ্রোহ ঘোষণা করে হত্যা ও লুটতরাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং কিছুদিন পরই তওবা করে ফিরে এসেছিল, কিন্তু হযরত আলী (রা) তাকে কোনরূপ শাস্তি দেন নি।

এখানে স্মর্তব্য যে, হদ মাফ হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, বান্দার যেসব হক সে নষ্ট করে, তাও মাফ হয়ে যায়। বরং এরূপ তওবাকারী যদি কারও অর্থ-সম্পদ অপহরণ করে থাকে এবং জীবিত থাকে, তবে তা ফেরত দেওয়া জরুরী এবং কাউকে হত্যা অথবা জখম করে থাকলে তার কিসাস জরুরী। অবশ্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা করে দিলে তা ক্ষমা হয়ে যাবে। কারও পার্থিব ক্ষতি করে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দান করা অথবা

ক্ষমা করিয়ে নেওয়া আবশ্যক। ইমাম আবূ হানীফা (র) সহ অধিক সংখ্যক ফিকহ্‌বিদের মযহাব তা-ই। এছাড়া বান্দার পাওনা থেকে অব্যাহতি লাভ করা স্বয়ং তওবার একটি অঙ্গ। এটা ছাড়া তওবা পূর্ণ হয় না। তাই কোন ডাকাতকে তওবাকারী বলে তখনই গণ্য করা হবে, যখন সে বান্দার পাওনাও পরিশোধ করে দেবে অথবা মাফ করিয়ে নেবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا
فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ
النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٧﴾ وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ
اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

(৩৫) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর—যাতে তোমরা সফলকাম হও। (৩৬) যারা কাফির, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আরও তদনুরূপ সম্পদ থাকে—আর এগুলো বিনিময়ে দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ থেকে তা কবূল করা হবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৩৭) তারা দোযখের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না। তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। (৩৮) যে পুরুষ চুরি করে, এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। এ সাজা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। (৩৯) অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ্ তার তওবা কবূল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৪০) তুমি কি জান না যে, একান্তভাবে আল্লাহ্‌র হাতেই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য! তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্‌কে (অর্থাৎ তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকে) ভয় কর (অর্থাৎ গোনাহ্ পরিত্যাগ কর) এবং (ইবাদতের মাধ্যমে) আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণ কর (অর্থাৎ জরুরী ইবাদতের পাবন্দি করতে থাক) এবং (ইবাদতের মধ্য থেকে বিশেষভাবে) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। আশা করা যায় যে, (এভাবে) তোমরা (পূর্ণ) সফলকাম হয়ে যাবে (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জিত হওয়া এবং দোযখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই সফলতা)। নিশ্চয় যারা কাফির, যদি (ধরে নেওয়া যায় যে,) তাদের (প্রত্যেকের) কাছে পৃথিবীর (ভূগর্ভস্থ গুপ্তধন ও ধনাগারসহ) সমুদয় সম্পদ এবং (শুধু তাই নয়) তৎসহ আরও তদনুরূপ সম্পদ থাকে এবং এগুলো বিনিময়ে দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও সে সম্পদ তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না (এবং তারা শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না;) বরং তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। (শাস্তিতে পতিত হওয়ার পর) তারা দোযখ থেকে (কোন রকমে) বের হয়ে আসার বাসনা করলে (তাদের সে বাসনা কখনও পূর্ণ হবে না।) তারা তা থেকে বের হতে পারবে না এবং তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে (অর্থাৎ কোন কৌশলেই শাস্তি ও শাস্তির স্থায়িত্ব টলবে না)।

আর যে পুরুষ চুরি করে এবং (এমনিভাবে) যে নারী চুরি করে, (তাদের সম্পর্কে নির্দেশ এই যে, হে বিচারকমণ্ডলী, তোমরা) তাদের উভয়ের হাত (কব্জি থেকে) কেটে দাও তাদের (এ) কৃতকর্মের বিনিময়ে। (আর এ বিনিময়) সাজা হিসেবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (নির্ধারিত)। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত (যা ইচ্ছা শাস্তি নির্ধারণ করেন এবং), বিজ্ঞ (তাই উপযুক্ত শাস্তিই নির্ধারণ করেন)। অতঃপর যে ব্যক্তি (শরীয়তের নিয়মানুযায়ী) তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের (অর্থাৎ চুরির) পর এবং (ভবিষ্যতের জন্য) সংশোধিত হয় (অর্থাৎ চুরি ইত্যাদি না করে এবং তওবায় অটল থাকে), তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তার (অবস্থার) প্রতি (অনুকম্পার) দৃষ্টি দেবেন (অর্থাৎ তওবার কারণে বিগত গোনাহ্ মাফ করবেন এবং তওবায় অটল থাকার কারণে আরও অধিক সুদৃষ্টি দেবেন)। নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল (কেননা, তওবাকারীর গোনাহ্ মাফ করে দেন।) অত্যন্ত দয়ালু। (যেহেতু ভবিষ্যতে আরও সুদৃষ্টি দেন। হে সম্বোধিত ব্যক্তি!) তুমি কি জান না (অর্থাৎ সবাই জানে) যে, আল্লাহ্‌র হাতেই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য, তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর, আল্লাহ্ সবকিছুর ওপর শক্তিমান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ডাকাতি ও বিদ্রোহের শাস্তি এবং তার বিস্তারিত বিধি উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী তিন আয়াতের পর চুরির শাস্তি বর্ণিত হবে। মাঝখানে তিন আয়াতে আল্লাহ্-ভীতি, ইবাদত ও জিহাদের প্রতি উৎসাহদান এবং কুফরী, নাফরমানী ও পাপের ধ্বংস-কারিতা বিবৃত হয়েছে। কোরআনের এ বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, কোরআন শাসকের ভঙ্গিতে শুধু দণ্ড ও শাস্তির আইন ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং অভিভাবকসুলভ ভঙ্গিতে অপরাধপ্রবণতা থেকে বিরত থাকার প্রতিও উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ্ ও

পরকালের ভয় এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও প্রশান্তিকে কল্পনায় উপস্থিত করে অপরাধীদের অন্তরকে অপরাধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। এ কারণেই অধিকাংশ অপরাধ ও দণ্ডবিধির সাথে সাথে اِتَّقُوا اللّٰهَ (আল্লাহ্‌কে ভয় কর) ইত্যাদি বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়। এখানেও প্রথম আয়াতে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রথমত اتقوا الله অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা, আল্লাহ্‌র ভয়ই মানুষকে প্রকাশ্য ও গোপন সকল অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে।

দ্বিতীয়ত وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ - অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণ কর।

وَسِيْلَةَ শব্দটি وسل ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। এ শব্দটি ص س উভয় বর্ণ দিয়ে প্রায় একই অর্থে আসে। পার্থক্য এতটুকু যে, وصل-এর অর্থ যে কোন রূপে সাক্ষাৎ করা ও সংযোগ করা এবং وسل-এর অর্থ আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সাক্ষাৎ করা--- (ছিহাহ, জওহরী, মুফরাদাতুল-কোরআন.)। তাই وصلة ও وصيلة ঐ বস্তুকে বলে, যা দুই বস্তুর মধ্যে মিলন ও সংযোগ স্থাপন করে---তা আগ্রহ ও সম্প্রীতির মাধ্যমে হোক অথবা অন্য কোন উপায়ে। পক্ষান্তরে وسيلة ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সংযুক্ত করে দেয়। ---(লিসানুল-আরব, মুফরাদাতুল-কোরআন)। وسيلة শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে হলে ঐ বস্তুকে বলা হবে, যা বান্দাকে আগ্রহ ও মহব্বত সহকারে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষী, সাহাবী ও তাবেয়ীরা ইবাদত, নৈকট্য, ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা আয়াতে উল্লিখিত وسيلة শব্দের তফসীর করেছেন। হাকিমের বর্ণনা মতে হযরত হোযায়ফা (রা) বলেন 'ওসীলা' শব্দ দ্বারা নৈকট্য ও আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। ইবনে জরীর, হযরত আতা (র), মুজাহিদ (র) ও হাসান বসরী (র) থেকে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ تقربوا اليه بطاعته والعمل بما يرضيه অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করে। অতএব, আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অন্বেষণ কর।

মসনদে আহ্‌মদ গ্রন্থে বর্ণিত এক সহীহ্ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ জান্নাতের একটি উচ্চ স্তরের নাম 'ওসীলা'। এর উর্ধ্বে কোন স্তর নেই। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর, যেন তিনি এ স্তরটি আমাকে দান করেন।

মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যখন মুয়াযযিন আযান দেয়, তখন

মুয়াযযিন যা বলে, তোমরাও তাই বল। এরপর দরূদ পাঠ কর এবং আমার জন্য ওসীলার দোয়া কর।

এসব হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, ওসীলা জান্নাতের একটি স্তর, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য নির্দিষ্ট। আলোচ্য আয়াতে প্রত্যেক ঈমানদারকে ওসীলা অন্বেষণের নির্দেশ বাহ্যত এর পরিপন্থী। উত্তর এই যে, হিদায়েতের সর্বোচ্চ স্থান যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরগুলো সব মু'মিনই প্রাপ্ত হবে, তেমনি ওসীলার সর্বোচ্চ স্তর রসূলুল্লাহ্ (সা) লাভ করবেন এবং এর নিম্নের স্তরগুলো মু'মিনরা প্রাপ্ত হবে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী তাঁর 'মকতুবাত' গ্রন্থে এবং কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী 'তফসীরে মাযহারী'তে বর্ণনা করেন যে, 'ওসীলা' শব্দটিতে প্রেম ও আবেগের অর্থ সংযুক্ত থাকায় বোঝা যায় যে, মু'মিনের পক্ষে ওসীলার স্তরসমূহের উন্নতি আল্লাহ্ ও রসূলুল্লাহ্ (স)-র প্রতি মহব্বতের ওপর নির্ভরশীল। মহব্বত সৃষ্টি হয় সুন্নতের অনুসরণের দ্বারা। কেননা, কোরআন বলে فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন।) তাই ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র, সামাজিকতা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সুন্নতের যত বেশী অনুসরণ করবে, আল্লাহ্র মহব্বত সে তত বেশী অর্জন করতে পারবে এবং আল্লাহ্র প্রিয়জনে পরিণত হবে। মহব্বত যত বেশী বৃদ্ধি পাবে, নৈকট্যও তত বেশী অর্জিত হবে।

'ওসীলা' শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের তফসীর থেকে জানা গেল যে, যে বস্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, তাই মানুষের জন্য আল্লাহ্র নিকটবর্তী হওয়ার ওসীলা। ঈমান ও সৎকর্ম যেমন এর অন্তর্ভুক্ত তেমনি পয়গম্বর ও সৎকর্মীদের সংসর্গ এবং মহব্বতও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এগুলোও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভেরই উপায়। এ কারণেই তাঁদেরকে ওসীলা করে আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করা জায়েয। দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ওমর (রা) হযরত আব্বাস (রা)-কে ওসীলা করে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করেছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা সে দোয়া কবুল করেছিলেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং জনৈক অন্ধ সাহাবীকে এভাবে দোয়া করতে বলেছিলেন ঃ اللهم انى اسئلك و اتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة [আল্লাহ্, আমি রহমতের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ওসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।]---(মানার)

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে আল্লাহ্-ভীতি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে নৈকট্য অন্বেষণের নির্দেশ দিয়ে বলা হচ্ছে ঃ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর। যদিও জিহাদ সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু সৎকর্মসমূহের মধ্যে জিহাদের স্থান যে শীর্ষে---একথা ফুটাবার জন্যে জিহাদকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে

বলা হয়েছে ঃ ذروة سنامه الجهاد অর্থাৎ ইসলামের শীর্ষস্থান হচ্ছে জিহাদের। এ ছাড়া জিহাদকে এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করার আরও একটি তাৎপর্য এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে দেশে অনর্থ ও অশান্তি সৃষ্টি করাকে হারাম ও অবৈধ বলে আখ্যা দিয়ে তার জাগতিক ও পারলৌকিক শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছিল। বাহ্যিক দিক দিয়ে জিহাদকেও দেশে অশান্তি উৎপাদনের নামান্তর বলে মনে হয়। তাই এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, কোন অজ্ঞ ব্যক্তি জিহাদ ও অশান্তির মধ্যে পার্থক্য না-ও বুঝতে পারে। এ কারণে দেশে অশান্তি সৃষ্টির নিষিদ্ধতা ঘোষণার পর জিহাদের নির্দেশ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করে এতদুভয়ের পার্থক্যের দিকে فِي سَبِيلِهِ শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ ডাকাতি, বিদ্রোহ ইত্যাদিতে যে হত্যাকাণ্ড ও অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করা হয় তা শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ, কামনা-বাসনা ও হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার নিমিত্ত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে জিহাদে হত্যা ও লুণ্ঠন থাকলেও তা শুধু আল্লাহ্‌র বাণী সমুন্নত করা এবং অত্যাচার ও অবিচার মিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয়। এতদুভয়ের মধ্যে আসমান-যমীন তফাৎ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে কুফর, শিরক ও গোনাহের মন্দ পরিণাম এমন এক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সামান্য চিন্তা করলেই তা মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তন সূচিত করতে পারে এবং মানুষকে এসব ত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারে।

সাধারণত মানুষ নিজের এবং পরিবার-পরিজনের বাসনা ও প্রয়োজন মেটাবার জন্যই গোনাহে লিপ্ত হয়। কেননা, টাকা-পয়সা ও অর্থ সঞ্চয় ব্যতীত এসব প্রয়োজন মেটে না। তাই সে হালাল ও হারামের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে অর্থ সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এ নেশার প্রতিকারকল্পে বলেছেন ঃ আজ তোমরা ক্ষণস্থায়ী জীবন ও তার আরামের জন্য যেসব বস্তু অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা সহকারে সঞ্চয় কর কিন্তু তারপরও সে সঞ্চয়-স্পৃহার অবসান হয় না। মনে রাখবে, এ অবৈধ লালসার পরিণাম শুভ নয়। কিয়ামতের আযাব যখন সামনে আসবে, তখন মানুষ জগতে সঞ্চিত সমুদয় অর্থ-সম্পদ, আসবাবপত্র সবই বিনিময়ে দিয়েও যদি এ আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, তবু তা সম্ভব হবে না। বরং ধরে নাও, যদি সমগ্র পৃথিবীর অর্থ-সম্পদ ও আসবাবপত্র এক ব্যক্তির হাতে সঞ্চিত হয়ে যায়, শুধু তাই নয় এই পরিমাণ আরও অর্থ-সম্পদ তার হস্তগত হয় এবং সে সবগুলোকে আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিনিময় প্রদান করতে চায়, তবুও তার কাছ থেকে কিছুই কবুল করা হবে না এবং সে আযাবের কবল থেকে মুক্তি পাবে না।

তৃতীয় আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, কাফিরদের ক্ষেত্রে এ আযাব হবে চিরস্থায়ী। তারা কখনও তা থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

চতুর্থ আয়াতে আবার অপরাধের শাস্তির দিকে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে চুরির শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, চুরির শাস্তি পূর্বোল্লিখিত হুদুদেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, কোরআন পাক স্বয়ং শাস্তি নির্ধারণ করেছে। এ কারণে এর নাম 'হদ্দে-সারাকাহ্' অর্থাৎ চুরির সাজা। বলা হয়েছে ঃ

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ০

অর্থাৎ যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, বিজ্ঞ।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআনী বিধি-বিধানে সাধারণত পুরুষদেরকে সম্বোধন করা হয় এবং নারীরাও তারই অন্তর্ভুক্ত থাকে। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও অন্যান্য বিধি-বিধানে কোরআন ও সুন্নাহ্র রীতি তাই। কিন্তু চুরির ও ব্যভিচারের শাস্তির বেলায় পুরুষ ও নারী উভয়কে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর কারণ এই যে, ব্যাপারটি হচ্ছে হুদুদের। আর সামান্য সন্দেহের কারণে হুদুদ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ে। তাই পুরুষদের অধীনস্থ করে মহিলাদেরকে সম্বোধন করা হয়নি, বরং সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

'সারাকাহ্' তথা চুরির আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা কি? এখানে এ প্রশ্নটিও প্রণিধানযোগ্য। 'কামুসে' বলা হয়েছে ঃ অন্যের মাল তার অনুমতি ব্যতিরেকে হেফাযতের জায়গা থেকে গোপনে নিয়ে যাওয়াকে চুরি বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায়ও একেই চুরি বলা হয়। এ সংজ্ঞাদৃষ্টে চুরি প্রমাণের জন্য কয়েকটি বিষয় জরুরী ঃ

প্রথমত, মালটি কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হতে হবে, তাতে চোরের মালিকানা অথবা মালিকানার সন্দেহও থাকবে না এবং এমন বস্তুও না হওয়া উচিত, যাতে জনগণের অধিকার সমান; যেমন---জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও তার বিষয়-সম্পত্তি। এতে বোঝা গেল যে, যে বস্তুতে চোরের মালিকানা অথবা মালিকানায় সন্দেহ আছে কিংবা যে বস্তুতে জনগণের কম অধিকার আছে; যেমন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তার বস্তুসমূহ; তা চুরি করলে চুরির হদ প্রযোজ্য হবে না এবং চোরের হাত কাটা যাবে না, বরং বিচারক তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী তাকে অন্য কোন সাজা দেবেন।

দ্বিতীয়ত, মালটি হিফাযতের জায়গায় থাকতে হবে অর্থাৎ তালাবদ্ধ গৃহে অথবা চৌকিদারের প্রহরায় থাকতে হবে। অরক্ষিত স্থান থেকে কোন কিছু নিয়ে গেলে তদ্দরুন হাত কাটা হবে না এবং মাল সুরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও হাত কাটা হবে না। তবে গোনাহ্ হবে এবং অন্য কোন শাস্তির যোগ্য হবে।

তৃতীয়ত, বিনানুমতিতে নিতে হবে। যে মাল নেওয়ার অথবা নিয়ে ব্যবহার করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হয়, সে যদি তা একেবারেই নিয়ে যায়, তবে চুরির হদ জারি হবে না এবং অনুমতির সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ প্রযোজ্য হবে না।

চতুর্থত, মালটি গোপনে নিতে হবে। কেননা, অপরের মাল প্রকাশ্যেই লুট করলে তা চুরি নয় ---ডাকাতি। এর শাস্তি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত শর্তাবলী থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের পরিভাষায় যাকে চুরি বলা হয়, তার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এর প্রত্যেকটিতে আইনত চুরির হদ তথা হস্ত কর্তন প্রযোজ্য নয়; বরং যে চুরিতে উপরোক্ত শর্তাবলী বর্তমান থাকে শুধু তাতেই হস্ত কর্তন করা হবে। এতদসঙ্গে একথাও জানা যাচ্ছে যে, যে অবস্থায় চুরির আলোচ্য শাস্তি রহিত হয়ে যায়, সেখানে চোর অবাধে ছাড়া পেয়ে যাবে না, বরং বিচারক তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী তাকে বেত্রদণ্ডও দিতে পারেন।

এমনিভাবে এরূপ মনে করাও উচিত নয় যে, যে চুরির কোন শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে চুরির শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না, সে চুরি শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ও হালাল বলে গণ্য হবে। কেননা, পূর্বেই বলা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে গোনাহ্ ও পরকালের শাস্তির উল্লেখ নেই—বিশেষ ধরনের জাগতিক শাস্তি উল্লেখিত হয়েছে মাত্র। কোরআনের অন্য আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, অন্যের মাল মালিকের সম্মতি ছাড়া গ্রহণ করা হারাম এবং আখিরাতের শাস্তির কারণ। لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ অর্থাৎ তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে খেয়ো না।

এখানে আরও উল্লেখ্য এই যে, কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি চুরি এবং ব্যভিচারের ক্ষেত্রে একই রকম। কিন্তু চুরির ব্যাপারে আগে পুরুষ ও পরে নারী এবং ব্যভিচারের ব্যাপারে আগে নারী ও পরে পুরুষ উল্লিখিত হয়েছে। চুরির আয়াতে وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (পুরুষ চোর এবং মহিলা চোর) বলা হয়েছে এবং ব্যভিচারের আয়াতে الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي (ব্যভিচারিণী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষ) বলা হয়েছে। তফসীরবিদরা এ ওলট-পালটের অনেক কারণ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে যে কারণটি সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী, তা এই যে, চুরির অপরাধ মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের জন্য অধিক গুরুতর। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষকে জীবিকা উপার্জনের যে শক্তি দান করেছেন, তা নারীর মধ্যে নেই। জীবিকার এত সব পথ খোলা থাকা সত্ত্বেও চুরির মত হীন অপরাধে লিপ্ত হওয়া পুরুষের অপরাধকে আরও গুরুতর করে দেয়। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীলোককে স্বাভাবিক লজ্জা-শরম ছাড়াও ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার মত উপযুক্ত পরিবেশও দিয়েছেন। এরপরও যদি সে নির্লজ্জতায় মত্ত হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে সেটা নিঃসন্দেহে জঘন্য অপরাধ। এ কারণে চুরির আয়াতে আগে পুরুষ এবং ব্যভিচারের আয়াতে আগে নারী উল্লেখ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে চুরির শাস্তি বর্ণনা করার পর দুটি বাক্য উল্লিখিত হয়েছেঃ এক, جَزَاءً بِمَا كَسَبَا অর্থাৎ এ শাস্তি হচ্ছে তাদের কৃতকর্মের ফল। দুই, نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ আরবী অভিধানে نكال এমন শাস্তিকে বলা হয়, যা দেখে অন্যেরাও শিক্ষা লাভ করতে

পারে এবং অপরাধ থেকে বিরত হয়। কাজেই আমাদের বাকপদ্ধতিতে نكال-এর অর্থ হবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হস্ত কর্তনের কঠোর শাস্তিটি এজন্য যাতে এক চোরের হাত কাটলে সব চোরের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে ; ফলে এ হীন অপরাধ বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় শব্দ مِنَ اللّٰهِ ব্যবহার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে। তা এই যে, চুরির অপরাধের দুটি দিক আছে। এক, চোর অন্যায়ভাবে অপরের মাল নিয়ে যায়। ফলে মালিকের প্রতি জুলুম করা হয়। দুই, সে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে। প্রথম দিক দিয়ে এ শাস্তিটি হচ্ছে মজলুমের বা মালিকের হক। ফলে সে মাফ করে দিলে মাফ হয়ে যাবে ; কিসাসের সব মাস'আলায় এমনিই হয়। দ্বিতীয় দিক দিয়ে এ শাস্তি আল্লাহ্ তা'আলার হক। ফলে মালের মালিক ক্ষমা করে দিলেও তা ক্ষমা হবে না---যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা না করবেন। শরীয়তের পরিভাষায় একেই হদ বলা হয়। আয়াতে مِنَ اللّٰهِ শব্দ প্রয়োগ করে এ দ্বিতীয় দিকটিই নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি হচ্ছে হদ---কিসাস নয়। অর্থাৎ রাজদ্রোহিতার অপরাধ হিসেবে এ শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কাজেই মালের মালিক ক্ষমা করে দিলেও এ শাস্তি রহিত হবে না।

আয়াতের শেষে وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ বলে একটি সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যা আজকাল সবার মুখে মুখে অর্থাৎ শাস্তিটি খুবই কঠোর। কোন কোন অজ্ঞ ও উদ্ধত লোক তো এমনও বলে ফেলে যে, এ শাস্তিটি বর্বর ও মধ্যযুগীয়। (নাউযুবিল্লাহি মিনহু) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কঠোর শাস্তিটি আল্লাহ্ তা'আলার পরাক্রান্ত হওয়ারই ফলশ্রুতি নয়, বরং তাঁর বিজ্ঞতার উপরও ভিত্তিশীল। আজকালকার ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা শরীয়তের যেসব শাস্তিকে কঠোর ও বর্বর বলে আখ্যা দেয়, সেগুলোর তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতের শেষ দিকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুকর্ম ও চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত হয় এবং আত্ম-সংশোধন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। কেননা, আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। পূর্ববর্ণিত ডাকাতির শাস্তির বেলায়ও ক্ষমা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আলোচ্য চুরির শাস্তির পরও ক্ষমার কথা উল্লেখ করা হল। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে ক্ষমার বর্ণনায় একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। এরই ভিত্তিতে উভয় শাস্তির মধ্যে ক্ষমার অর্থ ফিকহ্‌বিদদের মতে

ভিন্ন ভিন্ন। ডাকাতির শাস্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতিক্রম হিসেবে বলেছেন ঃ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ অর্থাৎ যারা সরকারের আয়ত্তে আসার এবং গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তওবা করবে, তারা এ শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে। কিন্তু চুরির শাস্তির পর যে ক্ষমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে জাগতিক শাস্তির কোন ব্যতিক্রম হবে না। বরং পরকালের দিক দিয়ে তাদের তওবা গৃহীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব এ তওবার কারণে বিচারক তার শাস্তি মওকুফ করবেন না। হাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা তার অপরাধ ক্ষমা করে পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি দেবেন। এ কারণে ফিকহ্‌বিদরা সবাই এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, গ্রেফতারীর পূর্বে ডাকাত তওবা করলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না। কিন্তু চোর চুরি করার পর গ্রেফতারীর পূর্বে অথবা পরে তওবা করলেও তার হস্ত কর্তন মাফ হবে না। অবশ্য গোনাহ্ মাফ হয়ে পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া এর পরিপন্থী নয়।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

অর্থাৎ আপনি কি জানেন না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে চান শাস্তি দেন আর যাকে চান ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এ আয়াতের সম্বন্ধ এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ডাকাতি ও চুরির শাস্তি---হস্তপদ অথবা শুধু হস্ত কর্তনের কঠোর বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছিল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এসব বিধান মানুষের মর্যাদা ও সৃষ্টির সেরা হওয়ার পরিপন্থী। এ সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিশ্ব জাহানের প্রভু। অতঃপর উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সর্বশক্তিমান। মাঝখানে বলেছেন যে, তিনি শুধু শাস্তিই দেন না---ক্ষমাও করেন। তবে এ ক্ষমা ও সাজা বিশেষ তাৎপর্যভিত্তিক হয়ে থাকে। কেননা, তিনি যেমন সবার প্রভু এবং সর্বশক্তিমান, তেমনি সুবিজ্ঞও বটে। মানবশক্তি যেমন তাঁর শক্তি ও আধিপত্যকে বেষ্টন করতে পারে না, তেমনি তাঁর রহস্যাবলী পূর্ণ বেষ্টন করাও মানুষের বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের কাজ নয়। তবে মূলনীতি ধরে যারা চিন্তা-ভাবনা করে, তারা প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রাপ্ত হয়---যার ফলে তাদের অন্তরের পিপাসা নিবৃত্ত হয়ে যায়।

ইসলামী শাস্তি সম্পর্কে ইউরোপীয়রা ও তাদের শিক্ষা-সভ্যতার ধ্বজাধারী কিছু সংখ্যক

লোকের সাধারণ আপত্তি এই যে, এগুলো অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম। অনেক অপরিণামদর্শী এ কথা বলতেও কুণ্ঠিত হয় না যে, এসব শাস্তি বর্বরোচিত ও সভ্যতা বিবর্জিত।

এ সম্পর্কে প্রথমে দেখা দরকার যে, কোরআন-পাক মাত্র চারটি অপরাধের শাস্তি স্বয়ং নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করেছে। শরীয়তের পরিভাষায় এগুলোকে 'হদ' বলা হয়। ডাকাতির শাস্তি ডান হাত ও বাম পা কর্তন করা, চুরির শাস্তি ডান হাত গিঁট থেকে কর্তন করা, ব্যভিচারের শাস্তি কোন কোন অবস্থায় একশত বেত্রাঘাত এবং কোন কোন অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা এবং ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত। পঞ্চম 'হদ' মদ্যপানের শাস্তি সাহাবীদের ঐকমত্যে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত হয়েছে। এ পাঁচটি ছাড়া সব অপরাধের সাজা বিচারকের বিবেচনাধীন ; তিনি অপরাধী এবং পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে যেরূপ ও যতটুকু শাস্তি উপযুক্ত মনে করবেন, দেবেন। এ ব্যাপারে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শক্রমে শাস্তির সীমা নির্ধারণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিচারকদের তা মেনে চলতে বাধ্য করাও জায়েয। যেমন আজকাল এসেম্বলীর মাধ্যমে দণ্ডবিধি নির্ধারণ করা হয় এবং বিচারক ও জজরা নির্ধারিত দণ্ডবিধির অধীনে মামলা-মোকদ্দমায় রায় দেন। তবে কোরআন ও ইজমা দ্বারা নির্ধারিত উপরোক্ত পাঁচটি অপরাধের শাস্তি পরিবর্তন করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা এসেম্বলীর নেই। কিন্তু এ পাঁচটির ক্ষেত্রে যদি শরীয়তের নির্ধারিত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা অপরাধ প্রমাণিত না হয় কিংবা অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর যেসব শর্তের অধীনে 'হদ' জারি করা হয়, সেগুলো পূরণ না হয়, তবে হদ জারি করা হবে না, বরং অন্য কোন দণ্ড দেওয়া হবে। এতদসঙ্গে এ নীতিটিও স্বীকৃত যে, অপরাধীরা সন্দেহের সুযোগ ভোগ করতে পারবে। অপরাধ প্রমাণে কিংবা অপরাধের শর্তাবলীর মধ্য থেকে কোন একটিতে সন্দেহ দেখা দিলে হদ রহিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শুধু অপরাধ প্রমাণিত হলেই সাধারণ দণ্ড দেওয়া হবে।

এতে বোঝা গেল যে, উপরোক্ত পাঁচটি অপরাধের মধ্যে অনেক অবস্থায় হদ প্রয়োগ করা যাবে না ; বরং বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী সাধারণ দণ্ডই দেওয়া হবে। সাধারণ দণ্ড শরীয়ত নির্ধারণ করেনি। কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সাধারণ আইনের অনুরূপ এগুলোতে পরিবর্তন ও কমবেশী করা যায়। কাজেই এগুলোর ব্যাপারে কারও আপত্তি করার অবকাশ নেই। এখন আলোচ্য বিষয় থেকে যাবে, শুধু পাঁচটি অপরাধের শাস্তি এবং এগুলোর বিশেষ বিশেষ অবস্থা। উদাহরণত চুরিই ধরুন এবং দেখুন যে, ইসলামে হস্ত কর্তনের শাস্তি সব চুরির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং যে চুরির কারণে চোরের হাত কাটা হয়, তার একটা বিশেষ সংজ্ঞা আছে। এর ব্যাখ্যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, অন্যের মাল হিফাযতের জায়গা থেকে বিনানুমতিতে গোপনে নিয়ে যাওয়াকেই সংজ্ঞাদৃষ্টে ও সাধারণ পরিভাষায় চুরি বলা হয়---এরূপ অনেক চুরির ক্ষেত্রে চুরির শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। উদাহরণত হিফাযতের জায়গার শর্ত থাকায় সাধারণ জনসমাবেশের স্থান যেমন, মসজিদ, ঈদগাহ, পার্ক, ক্লাব, স্টেশন, বিশ্রামাগার, রেল, জাহাজ ও সাধারণ বৈঠক ঘরে রাখা মাল কেউ চুরি করলে অথবা বৃক্ষের ঝুলন্ত ফল কিংবা মধু চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। বরং রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। এমনিভাবে যাকে আপনি গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে রেখেছেন সে চাকর, রাজমিস্ত্রী কিংবা অন্তরঙ্গ বন্ধু যাই হোক, সে যদি

ঘর থেকে কোন কিছু নিয়ে যায়, তবে প্রচলিত অর্থে যদিও এ কাজটি চুরির অন্তর্ভুক্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির যোগ্য, এতদসত্ত্বেও তার ক্ষেত্রে হস্ত কর্তনের শাস্তি প্রযোজ্য নয়। কেননা, সে আপনার বাড়ীতে অনুমতিক্রমে প্রবেশ করার কারণে তার বেলায় মালের হিফাযত অসম্পূর্ণ।

এমনিভাবে যদি কেউ কারও পকেট মারে কিংবা হাত থেকে অলংকার অথবা টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়, কিংবা প্রতারণা করে অর্থ হস্তগত করে, কিংবা গচ্ছিত দ্রব্য অস্বীকার করে, এগুলো সর্বসাধারণের পরিভাষায় অবশ্যই চুরির অন্তর্ভুক্ত----কিন্তু এগুলোর শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক এবং তা বিচারকের বিবেচনাধীন----হদ অর্থাৎ হস্ত কর্তন নয়।

এমনিভাবে কাফন-চোরের হাত কাটা হবে না। কারণ, প্রথমত জায়গাটি হিফাযতের নয় এবং কাফন মৃত ব্যক্তির মালিকানাধীন বস্তুও নয়। তবে এ কাজ সম্পূর্ণ হারাম। এর জন্য বিচারকের রায় অনুসারে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। এমনিভাবে কেউ যদি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শরীকানাধীন মাল অথবা ব্যবসায়ে শরীকানাধীন মাল চুরি করে, যাতে তারও অংশ আছে, তবে তার মালিকানার সন্দেহবশত তার হাত কাটা হবে না, অন্য কোন দণ্ড প্রয়োগ করা হবে।

উপরোক্ত শর্তাবলীর বর্তমানেই অপরাধ পূর্ণতা লাভ করে। এখন প্রমাণ পূর্ণতা লাভ করার জন্যও শর্তাবলী রয়েছে। শাস্তির ক্ষেত্রে ইসলাম সাক্ষ্য-প্রমাণের বিধি সাধারণ কাজ-কারবার থেকে স্বতন্ত্র ও সতর্কতার সাথে প্রণয়ন করেছে। ব্যভিচারের শাস্তিতে দু'জনের পরিবর্তে চারজন সাক্ষী শর্ত করা হয়েছে, তাও চাক্ষুষ ঘটনা সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাক্ষ্য দিতে হবে। চুরি ইত্যাদিতে দু'জন সাক্ষী যথেষ্ট হলেও এ দু'জনের জন্য সাধারণ সাক্ষ্যের শর্তাবলীর অতিরিক্ত কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণত অন্যান্য ব্যাপারে প্রয়োজনবশত বিচারককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, কোন ফাসিক ব্যক্তি সম্পর্কে বিচারক যদি নিশ্চিত হন যে, সে ফাসিক হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে না, তবে বিচারক তার সাক্ষ্য কবুল করতে পারেন, কিন্তু হুদূদের ক্ষেত্রে বিচারক এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য কবুল করতে পারেন না। সাধারণ কাজ-কারবারে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্যে রায় দেওয়া যায়, কিন্তু হুদূদের বেলায় দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য জরুরী। সাধারণ কাজ-কারবারে ইসলাম তামাদি অর্থাৎ ঘটনার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়াকে কোনরূপ ওযর বলে গণ্য করে না। দীর্ঘদিন পরে সাক্ষ্য দিলেও তা কবুল করা যায়। কিন্তু হুদূদে তাৎক্ষণিক সাক্ষ্য জরুরী। একমাস কিংবা আরও বেশী সময় পর কেউ সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

চুরির হদ প্রয়োগ সম্পর্কে যেসব শর্ত বর্ণিত হয়েছে, তা হানাফী মাযহাবের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'বাদায়ে-উস-সানায়ে' থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

মোট কথা, হদ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন শরীয়তের বিধি অনুযায়ী অপরাধ ও প্রমাণ উভয়টিই পূর্ণতা লাভ করবে। পূর্ণতা এভাবে যে, তাতে কোনরূপ দ্ব্যর্থতা থাকতে পারবে না। এতে বোঝা যায় যে, ইসলাম এসব অপরাধের যেমন কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছে, তেমনি এসব শাস্তি প্রয়োগের ব্যাপারে চূড়ান্ত সাবধানতার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে। হদসমূহের সাক্ষ্য

নীতিও সাধারণ কাজ-কারবারের সাক্ষ্যনীতি থেকে ভিন্ন ও চূড়ান্ত সাবধানতার উপর নির্ভরশীল। এতে সামান্য ত্রুটি থাকলেও হদ সাধারণ দণ্ডে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এমনিভাবে অপরাধের পূর্ণতায় কোন শর্তের অনুপস্থিতিও হদকে সাধারণ দণ্ডে পর্যবসিত করে দেয়। এর ফলে কার্যক্ষেত্রে হদের প্রয়োগ খুব কমই হয়ে থাকে। সাধারণ অবস্থায় হদজনিত অপরাধেও সাধারণ দণ্ড প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু শতকরা একভাগ ক্ষেত্রে হলেও যখন অপরাধ ও সাক্ষ্য-প্রমাণ উভয়টিই পূর্ণতা লাভ করে, তখন অত্যন্ত কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়, যার ভীতি মানুষের মন-মস্তিষ্ককে ঘিরে ফেলে এবং এ অপরাধের কাছে যেতেও তাদের দেহে কম্পন উপস্থিত হয়। নিঃসন্দেহে এটি অপরাধ দমন ও জন-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উপায়। বর্তমানে দেশে প্রচলিত দণ্ডবিধি এরূপ নয়। এসব দণ্ডবিধি পেশাদার অপরাধীদের দৃষ্টিতে একটি খেলা বিশেষ, যা তারা মনের আনন্দে খেলে থাকে। তারা জেলখানায় বসে বসে ভবিষ্যতে এ অপরাধটিকে আরও সুন্দর ও সুচারুরূপে করার পরিকল্পনা তৈরী করে। যেসব দেশে ইসলামী হুদূদ প্রয়োগ করা হয়, তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে বাস্তব সত্য সামনে এসে যাবে। আপনি সেসব দেশে অনেক মানুষকে হাত কাটা অবস্থায় দেখবেন না এবং বহু বছর অপেক্ষা করেও প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার ঘটনা দৃষ্টিগোচর হবে না। কিন্তু এসব শাস্তির ভীতি তাদের অন্তরে এমনভাবে বসে গেছে যে, কোথাও চুরি, ডাকাতি ও বেহায়াপনার নাম-নিশানাও নেই। সউদী আরবের অবস্থা প্রায় মুসলমানেরই প্রত্যক্ষভাবে জানা আছে। কারণ, হজ্জ ও ওমরা উপলক্ষে সব দেশের সব স্তরের মুসলমানই সেখানে উপস্থিত হয়। সেখানে প্রতিদিন পাঁচবার এ দৃশ্য চোখে পড়ে যে, দোকানপাট খোলা রয়েছে, লক্ষ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য সাজানো আছে, কিন্তু দোকানের মালিক দোকান বন্ধ না করেই নামাযের সময় হরম শরীফে চলে গেছে। সে সেখানে ধীরেসুস্থে ও নিশ্চিন্তে নামায আদায় করে। তার মনে কখনও এ কল্পনা দেখা দেয় না যে, বোধ হয় দোকানের কোন জিনিস চুরি হয়ে গেছে। এটি এক দু'দিনের ব্যাপার নয়, সারাজীবন এমনিভাবেই অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। জগতের কোন সভ্য দেশে এরূপ করে দেখুন, একদিনে শত শত চুরি ও ডাকাতি হয়ে যাবে। মানব সভ্যতা ও মানবাধিকারের দাবীদারদের অবস্থা আজবই বটে। পেশাদার অপরাধীদের প্রতি তাদের করুণার অন্ত নেই, কিন্তু এসব পেশাদার অপরাধী যাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে রেখেছে, তাদের প্রতি মানবাধিকারবাদীদের মনে কোন দরদ নেই। সত্য বলতে কি, কোন একজন অপরাধীর প্রতি করুণা করা সমগ্র মানবতার প্রতি জুলুম করারই নামান্তর এবং জননিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করার প্রধান কারণ। এ কারণেই রাব্বুল আলামীন---যিনি সৎ, অসৎ, আল্লাহ্-ভীরু, ওলী, কাফির ও পাপিষ্ঠ সবাইকে রিযিক দেন এবং সাপ, বিচ্ছু, সিংহ ও বাঘের মুখেও আহার যোগান, তিনি কোরআনে হুদূদের বিধি-বিধান নাযিল করার সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন ঃ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ—অর্থাৎ আল্লাহ্র হুদূদ প্রয়োগ করতে গিয়ে অপরাধীদের প্রতি কখনও দয়াদ্র হওয়া উচিত নয়। অপরদিকে তিনি কিসাসকে মানবজাতির 'জীবন' আখ্যা দিয়েছেন ঃ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ

حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ হে বুদ্ধিজীবিগণ, কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত)। যারা ইসলামী হুদূদের বিরোধিতা করে, মনে হয় দুষ্টের দমন তাদের কাম্যই নয়। নতুবা ইসলামের চাইতে বেশী দয়া ও করুণার শিক্ষা কে দিতে পারে? ইসলাম রণাঙ্গনেও যুদ্ধরত শত্রুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। ইসলামে নির্দেশ রয়েছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে নারী, বালক ও বৃদ্ধ সামনে এসে পড়লে তাদেরকে হত্যা করো না। ধর্মীয় আলিম যদি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয় এবং নিজ পন্থায় ইবাদতে মশগুল থাকে, তবে তাকেও হত্যা করো না।

সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় যে, ইসলামী শাস্তিসমূহের প্রতিবাদে তাদেরই কণ্ঠ সোচ্চার, যাদের হাত এখন পর্যন্ত হিরোশিমার লক্ষ লক্ষ এমন নিষ্পাপ ও নিরপরাধ মানুষের রক্তে রঞ্জিত যাদের মনে সম্ভবত কখনও যুদ্ধ ও সংঘর্ষের কল্পনাও জাগেনি। এসব নিহতের মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধ সবই রয়েছে। হত্যাকারীদের ক্রোধাগ্নি হিরোশিমার ঘটনার পরও নির্বাপিত হয়নি। তারা রোজই অধিকতর মারাত্মক বোমা আবিষ্কার এবং ভূগর্ভে তার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণে মশগুল রয়েছে। আমরা এ ছাড়া আর কি বলতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে স্বার্থপরতার পর্দা তুলে দিন এবং তাদেরকে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী আইন-কানূনের প্রতি হিদায়েত করুন।

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ
قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ
سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ۭ يُحَرِّفُوْنَ
الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ
وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ۭ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ
لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا ۭ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ
قُلُوْبَهُمْ ۭ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيْمٌ ۝ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ۭ فَاِنْ جَاۗءُوْكَ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ
شَيْـــًٔا ۭ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِيْنَ ۝ وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ

اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۭ وَمَآ اُولٰۗىِٕكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(৪১) হে রসূল! তাদের জন্য দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়; যারা মুখে বলেঃ আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা ইহুদী; মিথ্যে বলার জন্য তারা গুপ্তচরবৃত্তি করে। তারা অন্য দলের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলেঃ যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে কবুল করে নিও এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে আপনি কিছু করতে পারেন না। এরা এমনিই যে, আল্লাহ্ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি। (৪২) এরা মিথ্যা বলার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করে হারাম ভক্ষণ করে। অতএব, তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। যদি তাদের থেকে নির্লিপ্ত থাকেন তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে। যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন। (৪৩) তারা আপনাকে কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে অথচ তাদের কাছে তওরাত রয়েছে। তাতে আল্লাহ্র নির্দেশ আছে। অতঃপর এরা পেছন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা কখনও বিশ্বাসী নয়।

যোগসূত্রঃ সূরা মায়েদার তৃতীয় রুকূ থেকে আহ্লে-কিতাবদের আলোচনা চলছিল। মাঝখানে তাদের কিছু কিছু আলোচনা এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্য বিশেষ বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছিল। এখানে পুনরায় আহ্লে-কিতাবদের সম্পর্কেই সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আহ্লে-কিতাবদের মধ্যে ইহুদী ও খৃস্টান দুই সম্প্রদায় ছাড়াও আরেকটি সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল। এরা ছিল প্রকৃতপক্ষে ইহুদী, কিন্তু কপটতাপূর্বক মুসলমান হয়েছিল। তারা মুসলমানদের সামনে ইসলাম প্রকাশ করত, অথচ স্বধর্মাবলম্বী ইহুদীদের মধ্যে বসে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করত। আলোচ্য তিনটি আয়াত এ তিন সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ ও অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, এরা আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ও নির্দেশের বিপরীতে স্বীয় কামনা-বাসনা ও বিচার-বুদ্ধিকে অগ্রগণ্য মনে করে এবং আল্লাহ্র বিধান ও নির্দেশের মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় বাসনার ছাঁচে ঢেলে নেওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছনা ও অশুভ পরিণাম বর্ণিত হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে মুসলমানদের জন্য কতিপয় মৌলিক বিধান ও নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে।

শানে-নযূলঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ইহুদী গোত্রসমূহে সংঘটিত দুটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত দুটি অবতীর্ণ হয়। একটি ঘটনা ছিল হত্যা ও কিসাস বিষয়ক এবং অপরটি ছিল ব্যভিচার ও তার শাস্তি সংক্রান্ত।

ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন যে, ইসলাম-পূর্বকালে পৃথিবীর সর্বত্র ও সর্বস্তরে

অন্যায়-অত্যাচারের রাজত্ব চলছিল। সবল দুর্বলকে এবং উচ্চবিত্তরা নিম্নবিত্তদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখত। সবল-সম্ভ্রান্তের জন্য ভিন্ন আইন ছিল। বর্তমানকালেও সভ্যতার দাবীদার অনেক দেশে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গের জন্য পৃথক পৃথক আইন প্রচলিত রয়েছে। মানবতার দিশারী রসূলে-আরবী (সা)-ই এসব স্বাতন্ত্র্য চিরতরে মিটিয়ে দিয়েছেন, মানবাধিকারে সমতা ঘোষণা করেছেন এবং মানব ও মানবতাকে মনুষ্যত্বের সবক দিয়েছেন। মদীনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আগমনের পূর্বে মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইহুদীদের দু'টি গোত্র--বনী কুরায়যা ও বনী নুযায়রের বসতি ছিল। তন্মধ্যে বনী কুরায়যার তুলনায় বনী নুযায়রের শক্তি, শৌর্যবীর্য, অর্থ ও সম্মান বেশী ছিল। ফলে তারা প্রায়ই বনী কুরায়যার প্রতি অন্যায় অবিচার করত এবং তারা তা নির্বিবাদে সহ্য করত। এমনকি, তারা বনী কুরায়যাকে এ অবমাননাকর চুক্তি করতেও বাধ্য করল যে, যদি বনী নুযায়রের কোন ব্যক্তি বনী কুরায়যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে তাদের কিসাস অর্থাৎ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ লওয়ার অধিকার থাকবে না; বরং মাত্র সত্তর ওসক খেজুর রক্ত-বিনিময়স্বরূপ প্রদান করা হবে (আরবী ওজনে ওসক একটি পরিমাণ, যা আমাদের ওজনে প্রায় পাঁচ মণ দশ সেরের সমান)। পক্ষান্তরে বনী কুরায়যার কেউ বনী নুযায়রের কাউকে হত্যা করলে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে এবং বিনিময়ও দিতে হবে। এ রক্ত-বিনিময়ের পরিমাণ হবে বনী নুযায়রের রক্ত-বিনিময়ের দ্বিগুণ। অর্থাৎ একশ' চল্লিশ ওসক খেজুর। শুধু তাই নয়, নিহত ব্যক্তি মহিলা হলে তার বিনিময়ে বনী কুরায়যার একজন পুরুষকে হত্যা করা হবে এবং নিহত ব্যক্তি পুরুষ হলে তার বিনিময়ে বনী কুরায়যার দু'জন পুরুষকে হত্যা করা হবে। বনী নুযায়রের ক্রীতদাসকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে বনী কুরায়যার স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। বনী নুযায়রের কারও এক হাত কাটা হলে বিনিময়ে বনী কুরায়যার দু'হাত এবং এক কানের বিনিময়ে দু'কান কাটা হবে। ইসলামের পূর্বে এ গোত্রদ্বয়ে এ আইনই প্রচলিত ছিল। দুর্বলতাবশত বনী কুরায়যা তা-ই মানতে বাধ্য ছিল।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হিজরতের পর মদীনা যখন দারুল ইসলামে পরিণত হল, এ গোত্রদ্বয় তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং কোন চুক্তি বলেও ইসলামী বিধি-বিধান মেনে চলতে বাধ্য ছিল না। কিন্তু তারা দূরে থেকেই ইসলামের ন্যায়বিচার ও সাধারণ সহজবোধ্যতা নিরীক্ষণ করত। ইতিমধ্যে বনী কুরায়যার জনৈক ব্যক্তি বনী নুযায়রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। বনী নুযায়র উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী বনী কুরায়যার কাছে দ্বিগুণ রক্ত-বিনিময় দাবী করল। বনী কুরায়যা ইসলামে দীক্ষিত ছিল না এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে তাদের কোন চুক্তিও ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোক ছিল। তারা তওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী দৃষ্টে জানত যে, মুহাম্মদ (সা) শেষ নবী। কিন্তু ধর্মীয় বিদ্বেষ ও পার্থিব লোভের কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করত না। তারা আরও দেখছিল যে, ইসলাম মানবিক সমতা, ন্যায়বিচার ও ইনসাফের পতাকাবাহী। তাই বনী নুযায়রের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা একটি আশ্রয় খুঁজে পেল। তারা একথা বলে দ্বিগুণ রক্ত-বিনিময় দিতে অস্বীকার করল যে, আমরা ও তোমরা একই পরিবারভুক্ত, একই দেশের বাসিন্দা এবং একই ইহুদী ধর্মাবলম্বী। আমাদের দুর্বলতা ও তোমাদের জবরদস্তির কারণে এতদিন আমরা যে অসম ও অন্যায় চুক্তি মেনে চলেছি এখন থেকে তা আর মানব না।

এ উত্তর শুনে বনী নুযায়র উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হল। কিন্তু কতিপয় প্রবীণ লোকের পরামর্শক্রমে স্থির হল, ব্যাপারটির ফয়সালার জন্য উভয় পক্ষ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শরণাপন্ন হবে। বনী কুরায়যা মনে মনে তা-ই চাচ্ছিল। কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল, মহানবী (সা) বনী নুযায়রের উৎপীড়ন নীতি বহাল রাখবেন না। বনী নুযায়র পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এ প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়েও গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তারা মোকদ্দমা উত্থাপিত হওয়ার পূর্বেই কিছু লোককে পাঠিয়ে দিল, যারা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাদেরই স্বধর্মাবলম্বী ইহুদী। কিন্তু কপটতা-পূর্বক ইসলাম প্রকাশ করে মহানবী (সা)-র নিকট আসা-যাওয়া করত। বনী নুযায়রের উদ্দেশ্য ছিল, তার মোকদ্দমা ও ফয়সালার পূর্বে এ ব্যাপারে মহানবী (সা)-র মনোভাব ও মতবাদ জেনে নেওয়া। তারা গুরুত্ব সহকারে বলে দিল যে, যদি রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের পক্ষে রায় দেন, তবে তা মেনে নেব, অন্যথায় মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করব না।

এ ঘটনাটি ইমাম বগভী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। মসনদে আহমদ ও আবূ দাউদে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর সারমর্ম বর্ণিত রয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল ব্যভিচার সংক্রান্ত। ইমাম বগভীর বর্ণনা মতে এ ঘটনাটি ঘটে খায়বরের ইহুদীদের মধ্যে। তওরাত-নির্ধারিত শাস্তি অনুযায়ী উভয়কে প্রস্তরবর্ষণে হত্যা করা ছিল অপরিহার্য। কিন্তু তারা ছিল উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। ইহুদীরা প্রাচীন রীতি অনুযায়ী তাদের শাস্তি লঘু করতে চাইল। তারা জানত যে, ইসলামে মাস'আলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে অনেক নমনীয়তা আছে। তাই তারা মনে করল যে, এ শাস্তির ব্যাপারেও ইসলামের বিধান কঠোর না হয়ে নরমই হবে। সেমতে খায়বরের ইহুদীরা বনী কুরায়যাকে অনুরোধ করল, যাতে তারা মুহাম্মদ (সা)-এর দ্বারা এর মীমাংসা করিয়ে দেয়। অপরাধীদ্বয়কেও তারা সাথে সাথে পাঠিয়ে দিল। তাদেরও উদ্দেশ্য ছিল, যদি তিনি কোন লঘু শাস্তির রায় দেন, তবে মেনে নেওয়া হবে, অন্যথায় অস্বীকার করা হবে। বনী কুরায়যা প্রথমে ইতস্তত করল, কিন্তু কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর একথাই স্থির হল যে, কয়েকজন সর্দার অপরাধীদ্বয়কে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে যাবে এবং তাঁকে দিয়েই এর ফয়সালা করাবে।

সেমতে কা'ব ইবনে আশরাফ প্রমুখের একটি প্রতিনিধিদল অপরাধীদ্বয়কে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল ঃ যদি বিবাহিত পুরুষ ও নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাদের শাস্তি কি? মহানবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা আমার ফয়সালা মেনে নেবে কি? তারা সম্মতি প্রকাশ করল। ঠিক সে মুহূর্তেই ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) নির্দেশ নিয়ে অবতরণ করলেন যে, তাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করতে হবে। তারা এ ফয়-সালা শুনে তা মেনে নিতে অস্বীকার করল। জিবরাঈল (আ) মহানবী (সা)-কে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি তাদেরকে বলুন ঃ আমার এ ফয়সালা মানা-না-মানার জন্য ইবনে সূরিয়াকে বিচারক নির্ধারণ কর। অতঃপর জিবরাঈল (আ) ইবনে-সূরিয়ার পরিচয় ও গুণাবলী রসূ-লুল্লাহ্ (সা)-কে বলে দিলেন। তিনি আগত প্রতিনিধিদলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা ঐ শ্বেতকায় এক চোখ অন্ধ যুবককে চেন কি, যে ফাদাকে বসবাস করে এবং যাকে ইবনে সূরিয়া বলা হয়? সবাই বলল ঃ চিনি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা তাকে কিরূপ

মনে কর ? তারা বলল ঃ ভূ-পৃষ্ঠে তার চাইতে বড় কোন ইহুদী আলিম নেই। তিনি বললেন তাকে ডেকে আন।

ইবনে সূরিয়ার আগমনের পর রসূলে করীম (সা) তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বর্ণিত মাস'আলায় তওরাতের নির্দেশ কি ? সে বলল ঃ আপনি আমাকে যে সত্তার কসম দিয়েছেন, আমি তারই কসম খাচ্ছি। যদি আপনি কসম না দিতেন এবং মিথ্যা কথা বললে তওরাত আমাকে পুড়িয়ে দেবে---এ আশংকা না থাকত, তবে আমি এ সত্য প্রকাশ করতাম না। সত্য বলতে কি, তওরাতেও এ নির্দেশই রয়েছে যে, অপরাধীদ্বয়কে প্রস্তর মেরে হত্যা করতে হবে।

মহানবী (সা) বললেন ঃ তাহলে তোমরা কি কারণে তওরাতের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ কর ? ইবনে সূরিয়া বলল ঃ আসল ব্যাপার এই যে, আমাদের জনৈক রাজকুমার ব্যভিচারের অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। আমরা তাকে খাতির করে ছেড়ে দিলাম---প্রস্তর মেরে হত্যা করলাম না। কিছুদিন পর একজন সাধারণ লোক এ অপরাধে অভিযুক্ত হয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা তাকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করতে চাইল, কিন্তু অপরাধীর পক্ষে একদল লোক বেঁকে বসল। তারা বলল ঃ তাকে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি দিতে হলে আগে রাজকুমারকে দিতে হবে, নতুবা আমরা তার প্রতি শাস্তি প্রয়োগ করতে দেব না। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে, সবার পক্ষে গ্রহণীয় একটি লঘু শাস্তি প্রবর্তন করা দরকার এবং তওরাতের নির্দেশ পরিত্যাগ করা উচিত। সেমতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ব্যভিচারের অপরাধীকে কিছু মারপিট করে মুখে চুনকালি মাখিয়ে মিছিল বের করতে হবে। বর্তমানে এ শাস্তিই প্রচলিত রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে রসূল (সা), যারা কুফরে (অর্থাৎ কুফর সম্পর্কিত কাজকর্মে) দৌড়ে গিয়ে পড়ে, (অর্থাৎ অবাধে ও সাগ্রহে কুফর করে) তারা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে (অর্থাৎ আপনি তাদের কুফরী কাজকর্ম দেখে দুঃখিত হবেন না)। তারা ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হোক, যারা মুখে (মিছেমিছি) বলে ঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস স্থাপন করেনি। [অর্থাৎ ঈমান আনেনি। অর্থাৎ মুনাফিক দল, যারা এ ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এসেছিল] কিংবা তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হোক যারা ইহুদী। (দ্বিতীয় ঘটনায় তারা হাযির হয়েছিল।) এরা (উভয় শ্রেণীর লোক পূর্ব থেকে ধর্মের বিধান পরিবর্তনকারী আলিমদের মুখে) মিথ্যা কথাবার্তা শুনতে অভ্যস্ত, (এবং এসব মিথ্যা কথার সমর্থন অন্বেষণেই এখানে এসে) আপনার কথাবার্তা অন্য সম্প্রদায়ের খাতিরে কান পেতে শোনে, যাদের অবস্থা এই যে, (প্রথমত) তারা আপনার কাছে (অহংকার ও শত্রুতার কারণে স্বয়ং) আসেনি, (বরং অন্যকে পাঠিয়েছে। তাও সত্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে নয়, বরং স্বীয় পরিবর্তিত বিধানের অনুকূলে যদি কিছু পাওয়া যায় এজন্যে। কেননা, এরা পূর্ব থেকেই) আল্লাহ্র কালাম বিশুদ্ধ স্থানে কায়েম হওয়ার পর (শাব্দিক, অর্থগত অথবা উভয় প্রকারে) পরিবর্তন করে। (এ অভ্যাস অনুযায়ীই রক্ত বিনিময় এবং প্রস্তর বর্ষণের নির্দেশকেও মনগড়া প্রথায় পরিবর্তন করে দিয়েছে। এরপর ইসলামী শরীয়ত থেকে এ প্রথার সমর্থন পাওয়ার আশায় এখানে গুপ্তচরদের

পাঠিয়েছে। তৃতীয়ত স্বীয় পরিবর্তিত প্রথার অনুকূলে সমর্থন অন্বেষণ করেই ক্ষান্ত নয়, বরং প্রেরিত গুপ্তচরদের) তারা বলে ঃ যদি তোমরা (সেখানে গিয়ে) এ (পরিবর্তিত) নির্দেশই পাও, তবে তা কবুল করে নিও (অর্থাৎ তাকে কার্যে পরিণত করার ওয়াদা করো)। আর যদি তোমরা এ (পরিবর্তিত) নির্দেশ না পাও, তবে (তো তা কবুল করতে) বিরত থাকবেই। (অতএব, গুপ্তচর প্রেরণকারী সম্প্রদায়ের দোষ একাধিক—প্রথমত অহংকার ও শত্রুতার কারণে স্বয়ং না আসা, দ্বিতীয়ত সত্যান্বেষণ না করা, বরং সত্যকে বিকৃত করে তার সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করা এবং তৃতীয়ত অন্যদেরকেও সত্য কবুল করতে বারণ করা। এ পর্যন্ত আগমনকারী ও প্রেরণকারীদের পৃথক পৃথকভাবে নিন্দা করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে সবার নিন্দা করা হচ্ছে—) আর (আসল কথা এই যে,) যার খারাপ (ও পথভ্রষ্ট) হওয়া আল্লাহ্ তা'আলাই চান, (তবে এ সৃষ্টিগত চাওয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে পথভ্রষ্টতার সংকল্প করার পরই হয়ে থাকে।) তার জন্য (হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) আল্লাহ্র কাছে তোমার কোন জোর চলতে পারে না (যে, তুমি এ পথভ্রষ্টতাকে রোধ করে দেবে। এ হচ্ছে একটি সাধারণ রীতি। এখন বুঝবে যে,) এরা এমনই যে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে (কুফর থেকে) পবিত্র করতে চান না। [কেননা, তারা পবিত্র হওয়ার ইচ্ছাই করে না। তাই আল্লাহ্ সৃষ্টি-গতভাবে তাদেরকে পবিত্র করেন না, বরং তাদের পক্ষ থেকে পথভ্রষ্টতার সংকল্পের কারণে সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ্ তাদের খারাপ হওয়া চান। অতএব, কেউ তাদেরকে হিদায়েত করতে পারবে না। উদ্দেশ্য এই যে, তারা নিজেরাই খারাপ থাকার সংকল্প পোষণ করে এবং সংকল্পের পর তা সৃষ্টি করাই আল্লাহ্র রীতি। আল্লাহ্র এ সৃষ্টিকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। এমতাবস্থায় তাদের ভাল হওয়ার আশা কি? এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য অতি-রিক্ত সান্ত্বনার কারণ রয়েছে। এ সান্ত্বনার বিষয়বস্তু দ্বারাই আলোচনা শুরু করা হয়েছিল। অতএব, কথার শুরুতেও সান্ত্বনা এবং শেষেও সান্ত্বনা দেওয়া হল। পরবর্তী বাক্যে এসব কর্মের ফল বর্ণনা করা হচ্ছে যে,] তাদের (সবার) জন্য ইহকালেও লাঞ্ছনা রয়েছে এবং পরকালেও তাদের (সবার) জন্য বিরাট শাস্তি অর্থাৎ দোযখ রয়েছে। (মুনাফিকদের লাঞ্ছনা এই হয়েছে যে, মুসলমানরা তাদের কপটতা জেনে ফেলেছে। ফলে তাদের সবাইকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। আর ইহুদীদের হত্যা, জেল ও নির্বাসন তো হাদীস সূত্রেই সুবিদিত। পর-কালের শাস্তি আর বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।) এরা (ধর্মের ব্যাপারে) মিথ্যা শ্রবণে অভ্যস্ত—(যেমন, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) হারাম (মাল) ভক্ষণকারী। (এ লালসাই তাদেরকে ধর্মীয় বিধি-বিধান মিথ্যা বর্ণনায় অভ্যস্ত করে দিয়েছে। মিথ্যা বর্ণনার বিনিময়ে তারা কিছু নযরানা ইত্যাদি পেত। তাদের অবস্থা যখন এমন, তখন) তারা যদি (কোন মোকদ্দমা নিয়ে) আপ-নার কাছে (ফয়সালা করাতে) আসে, তবে (যদি আপনার ইচ্ছা) হয় আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। আর যদি আপনি (সিদ্ধান্ত নেন যে,) তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকবেন, তবে (এরূপ আশংকা করবেন না যে, তারা অসন্তুষ্ট হয়ে শত্রুতা সাধন করবে। কেননা,) তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে। (কারণ, আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার রক্ষক।) পক্ষান্তরে যদি আপনি (মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে) মীমাংসা করেন, তবে তাদের মধ্যে সুবিচার (অর্থাৎ ইসলামী আইন) অনুযায়ী মীমাংসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। (এখন ইসলামী

আইনেই সুবিচার সীমাবদ্ধ। এ আইন অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে, তারাই ভালবাসার পাত্র) এবং (আশ্চর্যের বিষয় এই যে,) তারা (ধর্মীয় ব্যাপারে) আপনার মাধ্যমে কিরূপে ফয়সালা করাবে? অথচ তাদের কাছে তওরাত (বিদ্যমান) রয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশ লিখিত রয়েছে (যে তওরাত মেনে চলার দাবী তারা করে, প্রথমত সেটাই আশ্চর্যের বিষয়।) অতঃপর (এ কারণে এ বিস্ময় আরও পাকাপোক্ত হয়ে যায় যে,) এর পেছনে (অর্থাৎ মোকদ্দমা দায়ের করার পেছনে, যখন আপনার রায় শোনে, তখন সে রায় থেকেও) মুখ ফিরিয়ে নেয়। (অর্থাৎ প্রথমত মোকদ্দমা দায়ের করাই আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু একথা ভেবে এ বিস্ময় দূর হতে পারত যে, বোধ হয় ইসলামের সত্যতা তাদের কাছে ফুটে উঠেছে এবং সে জন্যই এসে গেছে। কিন্তু যখন তারা এ রায় মানেনি, তখন বিস্ময় আবার সজীব হয়ে উঠেছে যে, তাহলে কি কারণে তারা মোকদ্দমা দায়ের করল?) এবং (এ থেকেই জানীমাত্র বুঝতে পেরেছে যে,) এরা কখনও বিশ্বাসী নয়। (বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আসেনি---মতলব সাধন করতে এসেছিল মাত্র। রায় না মানা যখন অবিশ্বাসের দলীল তখন এ থেকে আরও জানা গেল যে, নিজেদের গ্রন্থ তওরাতের প্রতিও তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস থাকলে তা ত্যাগ করে এখানে আসবে কেন? মোট কথা, তারা উভয় কুলই হারিয়েছে---যা অস্বীকার করেছে তার প্রতিও বিশ্বাস নেই এবং যার প্রতি বিশ্বাসের দাবী করেছে তার প্রতিও বিশ্বাস নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য তিনখানি আয়াত এবং তৎপরবর্তী কতিপয় আয়াত যেসব কারণ ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে ইহুদীরা কখনও স্বজন-প্রীতির বশবর্তী হয়ে এবং কখনও নাম-যশ ও অর্থের লোভে ফতোয়াপ্রার্থীদের মনমত ফতোয়া তৈরী করে দিত। বিশেষত অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে এটি ছিল তাদের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি। কোন বড়লোক অপরাধ করলে তারা তওরাতের গুরুতর শাস্তিকে লঘু শাস্তিতে পরিবর্তন করে দিত। তাদের এ অবস্থাটিই আয়াতের এ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় হিজরত করলেন এবং ইসলামের অভূতপূর্ব জীবনব্যবস্থা ইহুদীদের সামনে এল তখন তারা একে একটি সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করতে চাইল। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় একদিকে যেমন অনেক নমনীয়তা ছিল, অন্যদিকে তেমনি অপরাধ দমনের জন্য একটি যুক্তিযুক্ত বিধি-ব্যবস্থাও ছিল। যেসব ইহুদী তওরাতের কঠোর শাস্তিসমূহকে পরিবর্তন করে সহজ করে নিত, তারা এ জাতীয় মোকদ্দমায় রসূলুল্লাহ্ (স)-কে বিচারক নিযুক্ত করতে প্রয়াস পেত---যাতে একদিকে ইসলামের সহজ ও নরম বিধি-বিধান দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং অন্যদিকে তওরাত পরিবর্তন করার অপরাধ থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেও তারা একটি দুষ্কৃতির আশ্রয় নিত। তা এই যে, নিয়মিত বিচারক নিযুক্ত করার পূর্বে কোন-না-কোন পন্থায় মোকদ্দমার রায় ফতোয়া হিসাবে জেনে নিতে চাইত। উদ্দেশ্য---এ রায় তাদের আকাঙ্ক্ষিত রায়ের অনুরূপ হলে বিচারক নিযুক্ত করবে, অন্যথায় নয়।

এ সম্পর্কে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) যথেষ্ট মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন। তাই আয়াতের প্রারম্ভেই তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। এর পরিণাম আপনার জন্য শুভই হবে।

অতঃপর আয়াতে অবহিত করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা আন্তরিকতার সাথে আপনাকে বিচারক নিযুক্ত করছে না; তাদের নিয়তে গোলমাল রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ক্ষমতা দিয়ে বলা হয়েছে যে, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের মোকদ্দমার ফয়সালা করুন, নতুবা নির্লিপ্ত থাকুন। আরও বলা হয়েছে যে, আপনি যদি নির্লিপ্ত থাকতে চান, তবে তারা আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ আয়াতের বিষয়বস্তু তাই। পরের আয়াতে বলা হয়েছে, যদি আপনি ফয়সালাই করতে চান, তবে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ফয়সালা করুন। অর্থাৎ নিজ শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করুন। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে। কোরআনে যেসব আইন বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলো অবশ্য রহিত হয়নি। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্র আইনের বিরুদ্ধে অন্য কোন আইন, প্রথা ও প্রচলনের অধীনে মোকদ্দমার রায় প্রদান করাকে অন্যায়, পাপাচার ও কুফর আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমের মোকদ্দমা বিধি ঃ এখানে স্মর্তব্য যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদালতে মোকদ্দমা দায়েরকারী ইহুদীরা ইসলামে বিশ্বাসী ছিল না এবং মুসলমানদের অধীনস্থ যিম্মীও ছিল না। তবে তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি সম্পাদন করেছিল। এ কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন এবং ইচ্ছা করলে শরীয়ত অনুযায়ী তাদের মোকদ্দমার ফয়সালা করুন। কেননা, তাদের ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব ছিল না। তারা যিম্মী হলে এবং ইসলামী আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করলে তার ফয়সালা করা মুসলিম বিচারকের দায়িত্বে ফরয হত; নির্লিপ্ত থাকা জায়েয হত না। কেননা, তাদের অধিকারের দেখাশোনা করা এবং অত্যাচার থেকে রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে মুসলমান ও যিম্মীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ—অর্থাৎ তারা আপনার কাছে মোকদ্দমা নিয়ে আসলে আপনি শরীয়ত অনুযায়ী তার ফয়সালা করে দিন।

এ আয়াতে ক্ষমতা দেওয়ার পরিবর্তে নির্দিষ্ট করে ফয়সালা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবূ বকর জাসসাস আহকামুল কোরআন গ্রন্থে উভয় আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন যে, যে আয়াতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা ঐসব অমুসলিমের সম্পর্কে, যারা আমাদের রাষ্ট্রের বাসিন্দা অথবা যিম্মী নয় বরং নিজ দেশে বাস করে আমাদের

সাথে কোন চুক্তি করেছে। যেমন বনী কুরায়যা ও বনী নুযায়র। আর দ্বিতীয় আয়াত ঐসব অমুসলিমদের সম্পর্কে, যারা যিম্মী এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক।

এখন প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, উভয় আয়াতে অমুসলিমদের মোকদ্দমার নিজ শরীয়তানুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মনোবান্ছার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, এ নির্দেশ ঐসব মোকদ্দমা সম্পর্কেই দেওয়া হয়েছে, যা আলোচ্য আয়াত-সমূহের শানে-নযুলে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হত্যার শাস্তি ও রক্ত বিনিময়ের মোকদ্দমা এবং অপরটি হচ্ছে ব্যভিচার সংক্রান্ত মোকদ্দমা। এ জাতীয় মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে একই নিয়ম অর্থাৎ সমগ্র দেশে একই আইন বলবৎ থাকে। একে সাধারণ আইন বলা হয়। সাধারণ আইনে শ্রেণী অথবা ধর্মের কারণে কোনরূপ পার্থক্য হয় না। উদাহরণত চুরির শাস্তি হস্ত কর্তন শুধু মুসলমানদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, বরং দেশের যে কোন বাসিন্দার বেলায় এ শাস্তিই প্রযোজ্য। এমনিভাবে হত্যা ও ব্যভিচারের শাস্তিও সবার বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু অমুসলমানদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় ব্যাপারাদির ফয়সালাও যে ইসলামী আইন অনুযায়ী করতে হবে এমনটি জরুরী নয়।

স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) মদ্যপান ও শূকরের মাংস মুসলমানদের জন্য হারাম করে তার শাস্তিও নির্ধারিত করেছিলেন, কিন্তু অমুসলমানদের এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি অমুসলমানদের বিয়ে-শাদী ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করেন নি। তাদের ধর্ম অনুযায়ী যে বিয়ে শুদ্ধ ছিল, তিনি তাই বহাল রেখেছিলেন।

হিজরের অগ্নি পূজারী এবং নাজরান ও ওয়াদিয়ে কুরার ইহুদী ও খৃস্টানরা ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী ছিল। মহানবী (সা) জানতেন যে, অগ্নি উপাসকদের ধর্মে মা ও ভগিনীকেও বিয়ে করা হালাল। এমনিভাবে ইহুদী ও খৃস্টানদের ধর্মমতে ইদ্দত অতিবাহিত না করে এবং সাক্ষী ব্যতিরেকেও বিবাহ শুদ্ধ। কিন্তু তিনি কখনও তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করেন নি, বরং তাদের বিবাহ-শাদীর বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

মোট কথা, ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিষয়াদির মীমাংসা তাদেরই ধর্মমতের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। যদি এসব ব্যাপারে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তবে তাদের ধর্মাবলম্বী বিচারক নিযুক্ত করে ফয়সালা করাতে হবে।

তবে যদি তারা উভয় পক্ষ মুসলমান বিচারকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর রায় মেনে নিতে সম্মত হয়, তবে মুসলমান বিচারক ইসলামী আইন অনুযায়ীই ফয়সালা করবেন। কেননা, তখন তিনিই উভয় পক্ষের নিযুক্ত বিচারকরূপে গণ্য হবেন।

أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ আয়াতে নবী করীম (সা)-কে ইসলামী আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে দেওয়ার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার এক কারণ হয় এই যে, মোকদ্দমাটিই সাধারণ আইনের---যাতে কোন সম্প্রদায়ই আওতা-বহির্ভূত নয় অথবা এর কারণ এই যে, উভয় পক্ষ স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিচারক স্বীকার করে ফয়সালার

জন্য আসে। এমতাবস্থায় তাঁর ফয়সালা তাই হবে, যার প্রতি তাঁর ঈমান রয়েছে এবং যা তাঁর শরীয়তের নির্দেশ। মোট কথা, আলোচ্য প্রথম আয়াতে প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর ইহুদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়েছে। يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ—বাক্য থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে। এতে রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে যে, মহানবী (সা)-র কাছে যে প্রতিনিধি দলটি আগমন করেছিল তারা সবাই ছিল মুনাফিক। ইহুদীদের সাথে এদের গোপন যোগসাজশ রয়েছে এবং এরা তাদেরই প্রেরিত। এরপর প্রতিনিধিদলের কতিপয় বদভ্যাস বর্ণনা করে মুসলমানদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এগুলো কাফিরসুলভ অভ্যাস। এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত।

ইহুদীদের একটি বদভ্যাস ঃ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ—অর্থাৎ তারা মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনাতে অভ্যস্ত। তারা আলিম বলে কথিত বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদেরই অন্ধ অনুসারী। তওরাতের নির্দেশাবলীর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ দেখা সত্ত্বেও তারা তাদেরই অনুসরণ করে এবং তাদের বর্ণিত মিথ্যা ও অমূলক কিসসা-কাহিনীই শুনতে থাকে।

আলিমদের অনুসরণ করার বিধি ঃ যারা তওরাত পরিবর্তন করে এবং আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশাবলীতে মিথ্যা বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করে, আয়াতে তাদেরকে লক্ষ্য করে যেমন শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, তেমনি ঐসব লোককেও অপরাধী বলা হয়েছে, যারা তাদেরকে অনুসরণযোগ্য সাব্যস্ত করে মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এতে মুসলমানদের জন্যও একটি মৌলিক নির্দেশ রয়েছে যে, আলিমদের কাছ থেকে ফতোয়া নেওয়ার পূর্বে তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া দরকার। অজ্ঞ জনগণের ধর্মকর্ম করার একমাত্র পথ হচ্ছে আলিমদের ফতোয়া ও শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করা। রুগ্ন ব্যক্তি কোন ডাক্তার অথবা হাকীমের কাছে যাওয়ার পূর্বে কি করে? পরিচিতদের কাছে খোঁজ নেয় যে, এ রোগের জন্য কোন্ ডাক্তার পারদর্শী। কোন্ হাকীম বেশী ভাল? তার কি কি ডিগ্রী আছে? তার চিকিৎসাধীন রোগীদের পরিণাম কি? যথাসম্ভব খোঁজ-খবর নেওয়ার পরও যদি সে কোন ভ্রান্ত ডাক্তার অথবা হাকীমের ফাঁদে পড়ে যায়, তবে বিজ্ঞজনদের দৃষ্টিতে সে নিন্দার পাত্র নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনরূপ খোঁজ-খবর না নিয়েই কোন হাতুড়ে ডাক্তারের ফাঁদে পড়ে এবং পরিণামে অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট করে, বিজ্ঞজনদের মতে তার আত্মহত্যার জন্য সে নিজেই দায়ী হয়।

জনগণের ধর্মকর্মের অবস্থাও তাই। যদি তারা এলাকার বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে কোন আলিমের অনুসরণ এবং তার ফতোয়া অনুযায়ী আমল করে, তবে তারা মানুষের কাছেও ক্ষমাযোগ্য হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছেও। এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কেই রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ فان اثمه على من افتى অর্থাৎ এমতাবস্থায় আলিম ও মুফতী ভুল করলে এবং কোন মুসলমান তার ভুল ফতোয়া অনুযায়ী কাজ করলে, তার গোনাহ তার উপর নয়---বরং আলিম ও মুফতীর উপরই বর্তাবে, যদি সে